ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস: বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ

*ড. নূর সালমা খাতুন

সারসংক্ষেপ: উপন্যাস সময় আর ব্যক্তিজীবনকে একসূত্রে গেঁথে রাখে। সময়ের পরিক্রমায় ঘটে যাওয়া ঘটনা কোনো কোনো উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের উপন্যাসে সেভাবেই জায়গা করে নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। এটিই জাতির সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। হুমায়ূন আহমেদের *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে বৃহৎ কলেবরে মধ্যবিত্তের জীবনের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। অন্যদিকে আনোয়ার পাশার *রাইফেল, রোটি, আওরাত* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর বিভীষিকাময় সময়কে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। আর সেলিনা হোসেন তাঁর *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে গ্রামীণ শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে মুক্তিযুদ্ধের ভয়ংকর উপস্থিতিকে রূপায়ণ করেন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। শওকত ওসমানের *জলাংগী* উপন্যাসেও একইভাবে গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংস আর প্রতিরোধের গল্প উপস্থাপিত হয়েছে। রিজিয়া রহমানের *কাছেই সাগর* উপন্যাসে ঢাকাবাসী এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে ঢুকে পড়ে তাদের শূন্যে মিলিয়ে দেয় সেই গল্প শোনানো হয়েছে। রাবেয়া খাতুন তাঁর *ফেরারী সূর্য* উপন্যাসে বেশ বড় পরিসরে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করেন। যেখানে লড়াই, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ আর আত্মাহুতির ভিন্ন এক ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলো এসব উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের ৬টি উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

শত শত মুখ হায় একাত্তুর
যশোর রোড যে কত কথা বলে
এত মরা মুখ আধমরা পায়ে
পূর্ব বাংলা কোলকাতা চলে [১]

নিরাপরাধ এককোটি মানুষের শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন, লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণের বলি, লক্ষ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম হারানো, শয়ে শয়ে বুদ্ধিজীবীর জীবনের অবসান, সাধারণ মানুষের নিজভূমে পরবাসী হওয়া, স্বপ্নের মৃত্যু, ফসলের মাঠে রক্তের হোলিখেলা, বুটের তলায় থেঁতলে যাওয়া ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, লাশ বহন করে চলা নদীর স্রোত আর বেদনায় মুহ্যমান সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই হচ্ছে একাত্তরের ছবি। বিশ্ববিবেক কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই প্রান্তরের সহজ, সরল, প্রাণোচ্ছল মানুষগুলো শিকার হলো বিশ্বের জঘন্যতম গণহত্যার। ভেবে ওঠার আগেই লক্ষ প্রাণের হাহাকারে বাতাস গুমোট হয়ে উঠলো, বারুদের গন্ধে ভরে গেল শ্যামল বাংলা। শান্তিপ্রিয় একটি জাতির জন্য ট্যাংক নেমে এলো এই জনপদে। পোড়ামাটির নীতি যে বিভীষিকার জন্ম দিয়েছিল সেদিন এই মাটি আর মানুষেরা কোনোদিন ভুলতে পারবে? না, পারা উচিত? সেই দুর্বিষহ রাত আর দিনগুলো বাংলামায়ের শান্তিপ্রিয় দামাল ছেলেদের যোদ্ধা বানিয়ে দিয়েছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আর পিছু ফেরার কিছু থাকে না। তখন রাজনীতির জটিল সমীকরণ মাথায় না নিয়েও,

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী

ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকলেও, অস্ত্র ধরতে না জানলেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা অনিবার্য হয়ে উঠে। সেদিন সব শ্রেণি-পেশার মানুষ সময়ের প্রয়োজনে যোদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ মুক্তিযুদ্ধের কথোপকথন ভীষণ বিষাদে ভরা। অপমানের গ্লানি, অসহায়তার নির্মমতা, অনভিজ্ঞতার বিড়ম্বনা আর নিয়তির অমোঘ বিধানে শোকাতুর মানুষের জীবনের গল্প কলমের আঁচড়ে ধরে রাখার চেষ্টা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। ঔপন্যাসিকগণ পরম মমতায় বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নেওয়া যোদ্ধাদের অসমসাহসিকতার কাহিনি লিখে রেখেছেন তাঁদের উপন্যাসে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্পটা বীরত্বের, কষ্টের, বেদনার যা কোনোদিন মন থেকে মুছে যাবে না, মুছে যাবে না এই প্রান্তরের কোনো দিক হতে। চন্দ্র-সূর্যের মতোই জীবন্ত সেসব কথা।

ড. ক্ষেত্রগুপ্ত উপন্যাস নিয়ে বলেন:

> গদ্যের যে-ক্ষমতা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রযোজ্য, উপন্যাস তার সাহায্যে ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে বা ঘটনার সক্রিয়তা দেখাতে গিয়ে তার ব্যাখ্যান দেয়, কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করে, যুক্তি দেখায়। চরিত্রের কার্যাদি, ভাবনা বিশ্লেষণ করে। একাজের যোগ্যতা না আছে নাটকের, না আখ্যান-কাব্যের। ... ঔপন্যাসিক কখনও গীতিকবিতার সাদৃশ্যে গোটা উপন্যাসের চেহারায় মেজাজে আত্মমগ্নতা নিয়ে আসেন, ঘটনা-বাস্তবচিত্র-অন্যপাত্রাদি-সংলাপাদির মধ্যে তা বিন্যস্ত করে তাঁর ঔপন্যাসিক দায়িত্ব পূর্ণ করে তোলেন।[২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেও লেখকগণ গদ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তার অবয়ব নির্মাণ করেছেন।

বাংলাদেশের সাহিত্যে পাঠকপ্রিয় কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)- এর বৃহৎ কলেবরের উপন্যাস *জোছনা ও জননীর গল্প* (২০০৪)। ৭২ অংশে বিভক্ত ৫২৮ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের শ্যামল বাংলাকে ধারণ করার চেষ্টা করেছে। একাত্তরকে কেন্দ্র করে ঢাকা এবং বেশ কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে আগরতলা হয়ে পশ্চিমবাংলার শরণার্থী শিবির ঘুরে কলকাতা শহর, রাজনীতিবিদদের আশ্রয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বনেতৃবৃন্দ, সহমর্মী মানুষদের ছুঁয়ে আবার ঢাকায় এসে স্বাধীন বাংলার জয়পতাকা উড়িয়ে লবণজলে ভাসতে ভাসতে এর আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী কমলাপুর রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন।'[৩] আখ্যানের শুরুর বাক্যটি এমন। এভাবে পাঠকেরও ঢাকা শহরে প্রবেশ ঘটে একাত্তরের উত্তাল সময়ে। একটা কম আলোর মশাল মিছিল আখ্যানে উত্তেজনা ছড়ায়। ইরজাতউদ্দিনের ছোটভাই বেসরকারি চাকুরে শাহেদ স্ত্রী আসমানী ও শিশুকন্যা রুনিকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করে। একেবারে নির্ভেজাল মধ্যবিত্ত বাঙালি। আমরা ধীরে ধীরে এই শহরের মানুষ, তাদের চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। এখানে শাহেদের সহকর্মী এবং বন্ধু গৌরাঙ্গর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসে একাধিক ধর্মের মানুষের বিষয় সঙ্গত কারণেই এসেছে কারণ এই যুদ্ধের পেছনে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটি একটা অনুঘটকের কাজ করেছে। শাহেদের অফিসের মালিক মইন আরাফী মুর্শিদাবাদ থেকে দেশবিভাগের সময় এখানে চলে এসে ব্যবসা শুরু করে। বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটিকে সবাই 'বি হ্যাপি স্যার' বলে সম্বোধন করে আড়ালে। হুমায়ূন আহমেদের স্বভাবজাত

কিছু চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে আখ্যানে। শুরুর গল্পটা ভীষণই পারিবারিক আমেজে পরিপূর্ণ। আস্তে আস্তে শুরুর সেই কম আলোর মশাল মিছিল বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার ব্যাপ্তি বাড়াতে থাকে, সঙ্গে উজ্জ্বলতা এবং উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে আখ্যানের অবয়বজুড়ে। পারিবারিক জীবনের গল্প লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন হুমায়ূন আহমেদ। সেদিক থেকে বলা যায়, শাহেদ ও আসমানির টক-মিষ্টি সংসারের কথা উপন্যাসে অনেকটা জুড়ে রয়েছে। এর মধ্যে ঢুকেছে একটা যুদ্ধ, সাড়ে সাতকোটি মানুষের এক রাতের মধ্যে অনিকেত অনুভবে জারিত হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি। পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেনের সূত্র ধরে আমরা পাক আর্মির কাছে পৌঁছাই জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের গল্পে এবং এই মোবারক হোসেনের মাধ্যমেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর চলে আসে, চলে আসে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ। ইরতাজউদ্দীন নীলগঞ্জে ফেরত গেলে গ্রামের আর তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের একসঙ্গে বসবাসের আবহমান চিত্র আমাদের গোচরীভূত হয়। কলিমউল্লাহ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা-পিপাসু। এর মধ্য দিয়ে কবি শামসুর রাহমান অব্দি পৌঁছাই আমরা। আখ্যানে অনিবার্যভাবে ৭ই মার্চের প্রসঙ্গ এসেছে- এই দিনটি শাহেদের বন্ধু নাইমুল বিয়ের তারিখ হিসেবে বেছে নেয়। এই পড়ুয়ার ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। এর মাধ্যমে আমাদের পরিচয় হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সঙ্গে। আখ্যানে নেমে আসে সেই ভয়াল রাত। লেখকের ভাষায়:

> আকাশে ট্রেসার উড়ছে। আকাশ আলো হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে আলোর নকশা। যেন বারবার কালো আকাশে ঝলমলিয়ে উঠছে উৎসবের হাউই বাতি। তারাবাতির মতো আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে মেশিনগানের মুখ থেকে। বাজির শব্দের মতো গুলি। উৎসব। অন্য ধরনের উৎসব। হত্যা ও ধ্বংসের উৎসব। এই উৎসবের জন্য কেউ কি তৈরি ছিল? ঢাকার ঘুমন্ত মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল। কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?[৪]

'অপারেশন সার্চলাইট' এর বিবরণ, শাহেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, যুদ্ধ ঘোষণা, কারফিউ, রক্তের হোলিখেলা, নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু আমাদের ভয়ংকর সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায়। আখ্যানে পিরোজপুর মহকুমার পুলিশপ্রধান ফয়জুর রহমান সাহেবের প্রসঙ্গ আসে। লেখকের পারিবারিক বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অচলাবস্থা দেখানো হয়েছে। এরপর আখ্যানে সরাসরি জেনারেল টিক্কা খান উপস্থিত হন তার জন্মদিনের পার্টি নিয়ে। দেশের বুদ্ধিজীবী তথা সুশীল সমাজকে নিজের করায়ত্ত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। কলিমউল্লাহর সূত্র ধরে পাক সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে আমাদের পরিচয় হয় কিছুটা। পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবারকের মৃত্যুর খবর জেনে সরকারি আদেশেই কলিমউল্লাহ তার পরিবারের সাথে দেখা করতে আসে। এই পরিবারের দ্বিতীয় কন্যা মাসুমার সাথে এক পর্যায়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সে সময় বাবা-মায়েরা বিয়ের বয়সি কন্যাদের দ্রুত পাত্রস্থ করছিলেন এমন তথ্য আমরা প্রায় সব লেখাতেই পাই। ওদিকে মরিয়মের স্বামী নাইমুল যুদ্ধে যায়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ঠেলাগাড়িচালক আসগর আলি আখ্যানে জায়গা পায় এবং পাকবাহিনীর গুলিতে তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই। মৃত্যুর কিছু পূর্বে সে পাকদোসর সাংবাদিকদের বয়ান দিয়েছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। এই খবর যখন প্রচার হয় মানে দেশের অবস্থা সন্তোষজনক তখন আসগর আলি মহাকালে বিলীন হয়ে গেছে। শাহেদ তার স্ত্রী কন্যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকে। গৌরাঙ্গ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়ে। শাহেদ মিলিটারির হাতে

ধরা পড়লেও কোনো এক অলৌকিক কারণে বেঁচে যায় এবং যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আখ্যানে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আসে, আসে গোলাম আযম শান্তি কমিটির মিছিল নিয়ে। আসমানী মেয়ে রুনিকে নিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে স্বামীর উপর রাগ করে উঠেছিল। তারপর সেখানে আটকে যায়। বান্ধবীর বাবা মোতালেব সাহেবের গ্রামের বাড়িতে তাদের সঙ্গে ওঠে। আসমানী শরীরে আরেকটি শরীরের আন্দাজ পায়। বান্ধবীর বাবার নগ্ন অভিলাষ, স্বামী শাহেদের জন্য উৎকণ্ঠা, আর মাথার উপর অযাচিত যুদ্ধ, এতকিছু যে অসহায়তার জন্ম দেয় তার ষোলোকলা পূর্ণ হয় ওপার বাংলায় শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে। তার আগে আখ্যানে নীলগঞ্জ গ্রাম আর ইরতাজউদ্দিন ফিরে আসে। থানার সাহসী ওসি ছদরুল আমিন, তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কমলা, সাম্প্রদায়িকতা, মিলিটারি কনভয়, ডাকাত হারুন মাঝি, মেজর মোশতাক আর যুদ্ধের বিভীষিকা। আখ্যানে ওসি সাহেবের মৃত্যু এবং কমলার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। আসমানীর অনিশ্চিত যাত্রা। মনে হয় তার সাথে পুরো দেশটাই যেন ঠিকানাবিহীন যাত্রায় পা বাড়িয়েছে। ওদিকে ছিন্নমূল হয় এসডিপিও ফয়জুর রহমান সাহেবের পরিবার। আর তিনিও প্রাণ হারান। কিছু বিবৃতির পর আখ্যানে আত্মগোপন করে থাকা কবি শামসুর রাহমানকে দেখা যায় গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে। কলিমউল্লাহ খুঁজে বের করে কবিকে। নির্মলেন্দু গুণও লুকিয়ে আছেন ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা গ্রামে। নীলগঞ্জ আখ্যানে আসে আবার। ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেতকে বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করা হলেও যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শত্রুপক্ষের ভূমিকায় সে যথাযথই রোলই প্লে করে। গেরিলা যোদ্ধা নাইমুলের অপারেশনের প্রসঙ্গে যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আছে লেখকের পরিবারের আশ্রয়হীনতার অনুষঙ্গ। ২৫শে মার্চ আটকে পড়ে শাহেদ যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে বাড়ির বাচ্চা মেয়ে কংকনকে ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লা যাওয়ার পথে মেঘনায় ফেরিতে দেখে এবং আশ্চর্যজনকভাবে শরণার্থী শিবিরে কংকনের মা এবং দাদুকে পাওয়া যায়। শাহেদ তাদের হাতে মেয়েটিকে তুলে দেয়। লেখকের সাথে এই কংকনের নিউইয়র্কে অনেক পরে দেখা হয়, তখন সে তরুণী।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সন্তান হয় হাসপাতালে ৩০ জুলাই, ১৯৭১। বেগম সুফিয়া কামালের দিনলিপি থেকে সেটা তুলে দেওয়া হয় আখ্যানে। আছে পাকিস্তানের লায়ালপুরের জেলের একটি বিশেষ কক্ষে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান- এর প্রসঙ্গ। পত্রিকা থেকে বেগম মুজিবের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। আখ্যানে আবারও নীলগঞ্জ আসে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। ক্যাপ্টেন বাসেত আস্তানা গেঁড়েছে। হঠাৎ মাওলানা ইরতাজউদ্দিন এই বোধে তাড়িত হয় যে পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজের প্রয়োজন নেই। ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়াও তাকে বিষাদগ্রস্ত করেছে। এসবের বিনিময়ে ভয়ংকর মৃত্যু নেমে আসে তার জীবনে। যার জানাজা পর্যন্ত হয়নি। অবশ্য স্বাধীন দেশে হয়। দেখি শরণার্থী শিবিরের ভয়ংকর রূপ আর কঠিন লড়ায় আসমানীর। অবশ্য শাহেদের বন্ধু নাইমুল এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নাইমুল আর তার সহযোদ্ধা রফিকের অসম সাহসিকতার কথা এখানে রয়েছে। কলিমউল্লাহর সূত্র ধরে যুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ব্যবসার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন: নিখোঁজদের খবর দেওয়া সংক্রান্ত ব্যবসা বেশ জমজমাট হয়েছিল তখন। সুযোগসন্ধানী কলিমউল্লাহ গিরগিটির মতো রং বদলে নিজের ফায়দা হাসিল করেছে। যুদ্ধের সময় এমন একটা শ্রেণির উদ্ভব সাধারণত হয়ে থাকে। তাদের প্রতিনিধি সে। আখ্যানে কলকাতায় মাওলানা ভাসানী, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম,

প্রমূখের প্রসঙ্গও এসেছে। নাইমুলের ঢাকায় এসে শাহেদের সাথে দেখা করা এবং তার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ প্রদান আখ্যানে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানি জেনারেলদের আলোচনা যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে এবং সেখানে কাদের সিদ্দিকীর কথাও আসে। তার সাহসিকতার কথা আখ্যানে বিস্তারিতভাবে এসেছে। টর্চার সেলের কথাও আছে। ইন্দিরা গান্ধীর সূত্র ধরে চীন ও মার্কিন প্রসঙ্গ চলে আসে আখ্যানে। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ শাহেদ বারাসাতে তার স্ত্রী-কন্যার সাক্ষাৎ পায়। যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশিদের হয়ে পাকবাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। চৌদ্দই ডিসেম্বর অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ রায়কে ধরে নিয়ে যায় কলিমউল্লাহ এবং পরের দিন স্বাধীনতা নিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতে করতে স্ত্রী মাসুমার সবুজ শাড়ি দিয়ে পতাকা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষ অংশে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনাটা এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, 'ঢাকা রেসকোর্সে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করলেন। তিনি তার কোমরের বেল্টে ঝুলানো পিস্তল তুলে দিলেন লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরার হাতে। ঘড়িতে তখন সময় বিকাল চারটা উনিশ মিনিট।'[৫] উপন্যাসে মুক্তিযোদ্ধা নাইমুলকে ফিরিয়ে আনা হলেও উপন্যাসের শেষটা এমন:

> বাস্তবের সমাপ্তি এরকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখেনি। সে ফিরে আসতে পারেনি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানে না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে। তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনার রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহারে! আহারে![৬]

উপন্যাসটির পরিশিষ্টে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা এবং সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির নাম সন্নিবেশিত রয়েছে। 'খণ্ড ঘটনায় পুরো মুক্তিযুদ্ধ এবং খণ্ড ভূমিতে পুরো দেশকে উপস্থাপনের বদলে একই প্লটে মুক্তিযুদ্ধের এবং দেশের সামগ্রিকতাকে ধারণ করার উদ্যোগ আছে *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে।'[৭] বিস্তৃত পরিসরে একাত্তরের এই জনপদকে আখ্যানে ধারণ করার চেষ্টা অনুভূত হয়। তবে একটু ছড়ানো-ছিটানো। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে যেমনটা বলা হয়ে থাকে যে বড় প্লটের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই তা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে যায়। এক্ষেত্রেও তেমনটা ঘটেছে। কাহিনির বাঁধুনি কিছুটা ঢিলেঢালা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক উপন্যাসেই প্লটের কাঠামোর দিকে লেখকের মনোযোগ কম গোচরীভূত হয় বরং বিষয়ের দিকেই তাঁদের শতভাগ মনোযোগ কেন্দ্রিভূত থাকে। এই উপন্যাসে শিল্প তৈরির চেয়ে লেখকের ইতিহাসমগ্নতার দিকটি বেশি পরিলক্ষিত হয়। স্থান, কাল তুলে ধরে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের আলোকে ঘটনার বাস্তবতা শিল্পকে ক্ষুণ্ন করলেও অন্য একটা আবেদন তৈরি করেছে ঠিকই। অর্থাৎ এই গ্রন্থটিকে উপন্যাস হিসেবে যেমন পাঠ করা যায় ঠিক তেমনি ইতিহাসগ্রন্থ তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবেও পাঠ করা যায়। যদিও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বিষয়কে ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। তবে একটা বিষয় লেখক কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি বরং নিজের মতো করে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সহজ-সরল বিশ্লেষণে অবস্থাকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মাওলানা ইরতাজউদ্দিন আর তার ছোট ভাই শাহেদকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়েছে- কিছু বিক্ষিপ্ত বিষয়ও এসেছে। এখানে সবগুলোর সম্পর্ক খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হয়। তবে কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সময়, প্রেক্ষাপট আর এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরতে এসবের প্রয়োজন ছিল। বিন্যস্ত, বিস্তৃত, একটু শিথিল এই প্লটের বাঁধুনি তবে চরিত্রায়ণের বিষয়টি

উল্লেখ করার মতো। শাহেদ ও আসমানীর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সাতে-পাঁচে না থাকা বাঙালিকে তুলে ধরা হয়েছে যাদের রাজনীতি নিয়ে মাথাব্যথা না থাকলেও এর ছোবল থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ইরতাজউদ্দিনের মধ্যে ব্যাপক নিরীক্ষার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। খুব সাদামাটাভাবে তার শুরুটা হলেও পরিণতিটা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো। একটা জটিল ফ্রেমে সে নিজেকে আটকে ফেলে। লেখক তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন বিদ্রোহের ধোয়া যা আগুনে রূপ নেয়। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হতে পারে না- এই বোধ তিনি লাভ করেন জুম্মার নামাজ পড়াতে গিয়ে এর সঙ্গে কিন্তু আরেকটি অনুষঙ্গ অনুঘটকের কাজ করেছে- যে চারজন হিন্দু ঐ মসজিদ প্রাঙ্গণে এসেছে বা আনা হয়েছে ধর্মান্তরিত করার জন্য। এদের ইরতাজউদ্দিন বলে, "পবিত্র কোরান মজিদে একটা বিখ্যাত আয়াত আছে- 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বিন।' যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ইসলাম অন্য ধর্মের উপর জবরদস্তি করে না।"[৮] তার আগে অবশ্য বলে, 'আমাদের ধর্ম বলে জীবন বাঁচানো ফরজ। মুসলমান হলে যদি জীবন রক্ষা হয়, তাহলে মুসলমান হন। জীবন রক্ষা করেন।'[৯] এরপরে এই চরিত্রটি নিয়ে বেশি কিছু বলার থাকে না। তার উদারনৈতিক এবং সংস্কারমুক্ত একটা ছবি পাঠকের গোচরীভূত হয়ে যায়। অবশ্য এর ফল তাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়। যুদ্ধাক্রান্ত একটা জনপদে এটাই তো স্বাভাবিক। আর অতি সংগোপনে লেখক তাঁর চরিত্রায়ণের কেরামতিটাও দেখিয়ে দেন। অসংখ্য অগণন চরিত্র- কখনো বিস্তৃত পরিসরে কখনো তুলির একটি টানে তাদের নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক। হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ভীতসন্ত্রস্ত রূপ এই সময়ের সব লেখাতেই দেখা যায়। নাইমুল 'অপারেশন সার্চলাইট'এর ফলে বিধ্বস্ত ঢাকাকে দেখে তার আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় নবপরিণীতা স্ত্রী মরিয়মকে এবং সে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয়ও দেয়। তার সহযোদ্ধা রফিক এবং বাস্তব থেকে উঠিয়ে আনা আরও অনেক চরিত্রের সমাগম ঘটেছে এখানে। কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, লেখকের পিতা, মাতা, ভাই, বোন এদের সঙ্গে কংকন, রফিক এর মতো আরও অনেকে। আছে পাকসরকারের শাসকরা আর আছেন বাংলার প্রাণপ্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই উপন্যাসে পাকবাহিনীর বিভিন্ন সদস্যের চরিত্রায়ণেও বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। তাদের হিংস্র রূপ এবং এর পাশাপাশি নিরীহ রক্ত-মাংসের অতি সাধারণ মানুষটাকেও বের করে আনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আছে যুদ্ধের বাজারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠাদের কথা। কলিমউল্লাহদের মতো সুযোগসন্ধানীদের আঁকতেও ভোলেন না লেখক। যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত জীবনকে বাস্তবসম্মতরূপে উপস্থাপনের প্রয়াসে স্থান কাল ও পাত্রের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করার মতো।

এই উপন্যাসের ভাষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো বেগবান। পাঠককে ধরে রাখে আষ্টেপৃষ্ঠে। না, অক্টোপাশের মত দম আটকায় না বরং কোমল অনুভবে জারিত করে পাঠককে। ছোট ছোট বাক্য যার বেশির ভাগই সরল বাক্য এবং এতে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও অযথা জটিলতাকে পরিহার করে সহজ শব্দের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। ফলে এমন গাঁথুনি দিয়ে উপন্যাসের শরীর নির্মিত হয়েছে যেখানে পাঠকের স্বস্তির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের গদ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর হিউমার। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় জীবনের অনেক জটিল কঠিন বিষয়কে অনায়াসে এঁকে ফেলেন এই লেখক। উপন্যাসের শুরুতেই এই গদ্যের যাদুকরের বিশেষত্ব তথা ভাষায় হিউমারের প্রয়োগ লক্ষগোচর হয়:

> ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর হাতে ধবধবে সাদা রঙের একটা রাজহাঁস। তিনি ডান হাতে রাজহাঁসের গলা চেপে ধরে আছেন। রাজহাঁস ছটফট করছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে।

> কাশেমপুরীর মুখ থমথম করছে, কারণ ট্রেন থেকে নামার সময় এই বিশাল পক্ষী ঠোকর দিয়ে তাঁর কনুই থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। জনতা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কাশেমপুরী ও তাঁর রাজহাঁস জনতার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ মিশ্রিত আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।[১১]

না, শুধু জনতা নয় পাঠকও কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করে। সাদামাটা শব্দের প্রয়োগে এমন আবহ তৈরি করেন হুমায়ূন আহমেদ যে তার চিত্রটা জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের চোখে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে এভাবে :

> খটখট শব্দ হলো। শাহেদ একটু কেঁপে উঠল। চোখের সামনে দৃশ্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। এখন আবার স্পষ্ট হয়েছে। ঐ তো চারজন মানুষ। তাদের উল্টোদিক করে দাঁড় করানো হয়েছে। তাদের বাঁধা হাত দেখা যাচ্ছে। রাইফেল তাক করে আছে অনেকে। কতজন? শাহেদ কি গুনে দেখবে? তার প্রয়োজন কি আছে? আচ্ছা, ভোর হতে কত দেরি? আকাশে কি তারা আছে? শাহেদ কি তাকাবে আকাশের দিকে? ঐ তো কালপুরুষ দেখা যাচ্ছে। কালপুরুষের কোমরের বেল্টে তিনটা তারা।
>
> ফায়ার।
>
> 'ঠিকই শব্দ হলো। তারা দাঁড়িয়েছিল তারা এখন দাঁড়িয়ে নেই'।[১২]

উদ্ধৃতির চিহ্নিত লাইনটি লক্ষ করার মতো। যুদ্ধের সময় বধ্যভূমিতে সার করে দাঁড় করিয়ে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার দৃশ্য এটি। ফায়ারের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ানো মানুষগুলো আর দাঁড়িয়ে নেই। এর বেশি কিছু বলারও প্রয়োজন পড়ে না। এভাবে রূপায়িত হয় যুদ্ধের বিভীষিকাময় নির্মম সব ঘটনা।

সামগ্রিক বিবেচনায় এই উপন্যাসের শিল্পসফলতায় ত্রুটিবিচ্যুতি কিছুটা ধরা পড়ে প্লটের সংগঠনে। বিষয়ের শৈথিলতাও লক্ষ্যযোগ্য। সমালোচকের ভাষায়:

> বস্তুত এ এক সামবায়িক রচনা। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের পরিমাণ বিস্তর। অন্যদের বিবরণী ব্যবহৃত হয়েছে দেদার। লেখকের নিজের ঔপন্যাসিক বিবরণীতে মূল কাজ ছিল দুটি। এক. ব্যক্তির দিক থেকে ব্যাপারগুলোকে হাজির করা। দুই. সামগ্রিকতার বোধ তৈরি করা। দুই ব্যাপারেই হুমায়ূন খুব উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। তবে ইতিহাসের প্রভাবশালী বয়ান, স্মৃতিকথাগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার চাপ, দিন-তারিখ ঠিক রেখে বিতর্ক এড়ানোর চেষ্টা বহু অংশে উপন্যাসের ক্ষতি করেছে। হুমায়ূন সম্ভবত বর্তমানের বিতর্কপ্রবণ পক্ষগুলোর জন্য স্বস্তির বন্দোবস্ত করতে চেয়েছেন। তথ্য-উপাত্তকে বিশদ পটভূমিতে নির্বাচিত চরিত্র ও ঘটনার প্লটে গেঁথে ফেলার পরিশ্রম কমাতে চেয়েছেন কি? যে জন্যই এ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হোক, নান্দনিক বিচারে পদ্ধতিটা খুব একটা কাজের হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের দিক থেকে এটা বরং একটা গুরুতর সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। বড় প্লট সামলানোর ক্ষেত্রে হুমায়ূন প্রায় কখনোই সাফল্যের পরিচয় দেননি। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসেই এ ধরনের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উপন্যাসের বিবরণীর বদলে আলগা তথ্য-বিবরণী যুক্ত করায় সে সম্ভাবনা কমেছে।[১৩]

এই মন্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেও বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কে একটা বৃহৎ পটভূমিতে উপস্থাপনের প্রয়াসকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে পরিশ্রমসাধ্য এ লেখা। হয়তো ঔপন্যাসিক ইতিহাসের পাঠকে গুরুত্বের মধ্যে এনেই চরিত্রের মাধ্যমে নয়, তথ্যসূত্রের

সাহায্যে ঘটনার বিবরণকে তুলে ধরে এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এই চেষ্টাকে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তবে এই আলোচনায় যেহেতু *জোছনা ও জননীর গল্প*কে উপন্যাসের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে তাই এই অনুষঙ্গগুলো এর শৈল্পিকভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এমন সিদ্ধান্তে আমরা আসতে বাধ্য হচ্ছি। তবে এককথায় বলা যায়, সুখপাঠ্য গদ্যের এই বৃহৎ লেখাটি বাঙালি জাতির সবচেয়ে কষ্টের, সবচেয়ে বেদনার এবং সবচেয়ে গর্বের, সবচেয়ে অহংকারের জীবনের বয়ান।

শহিদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) কালজয়ী উপন্যাস *রাইফেল, রোটি, আওরাত*। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস এর রচনাকাল। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলা পরে পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসনের নামে শোষণের শিকার হয়েছিল, শিকার হয়েছিল ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের তার সাক্ষ্যপ্রমাণ এই লেখাটি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে ক্ষমতালোলুপ হায়েনার দল নিরপরাধ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে হত্যার ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রণয়ন করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। সেই রাতে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা আর মরে গিয়েছিল সকল স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা। নিজভূমে পরাধীন একরাতের মধ্যে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। সমগ্র দেশটা যখন হায়েনার দখলে তখন নিজের কারাগারে বন্দি অসহায় মানুষ আর সেই রুদ্ধশ্বাসে ভরা ভয়ংকর দিনগুলিতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যোদ্ধার মতো কলম চালিয়ে লিখে রেখে গেছেন আনোয়ার পাশা এই উপন্যাস। এমন যুদ্ধোপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। জীবন ও মৃত্যুর ব্যাখ্যাটাই ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় এই উপন্যাসে :

> . . . অনেকেই যে বেঁচে আছেন সেটা সুদীপ্তর কাছে পরম বিস্ময় ব'লে মনে হয়েছিল। অনেকে যাঁরা মরেছিলেন তাঁরা যেন খুব স্বাভাবিক একটা কর্ম করেছেন। অতএব সকলেই তাঁদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত অসাড়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু জীবিতদের নিয়ে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।
>
> . . .
>
> সেই পঁচিশের রাত থেকে মৃত্যুটা কি কোনো সংবাদ? মৃত্যু এখন তো অতি সাধারণ অতি স্বাভাবিক আটপৌরে একটি ঘটনা মাত্র।[১৪]

কীভাবে ঐ রাতে মৃত্যু একটা আটপৌরে ঘটনা হয়ে উঠেছিল সেটা বোঝার জন্য উপন্যাসের আখ্যানের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন থাকেন ক্যাম্পাসের আবাসিক এলাকায়। পঁচিশ ও ছাব্বিশ মার্চ, ৭১ পাকবাহিনী পুরো ঢাকা শহরে যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় তার একটা বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা রয়েছে সুদীপ্ত শাহিনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আবাসিক এলাকাতে সশস্ত্র পাকসেনারা ঢুকে শিক্ষকদের উপর গুলি চালায়। আবাসিক হলগুলোতে ঢুকে ছাত্রদের হত্যা করে, ছাত্রীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়, লুটপাট করে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রস্থলকে গুঁড়িয়ে দিতে আরও ধ্বংস করে পত্রিকা অফিস। বেছে বেছে শিকারে পরিণত করে শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিককর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের। রেহাই পায় না বস্তিবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এমনকি মসজিদের মোয়াজ্জিন, ইমামও। সুদীপ্ত শাহিন অন্ধকূপ থেকে বের হয়ে বন্ধু ফিরোজের বাসায় সপরিবার আশ্রয় নেয় আর পথের এসব দৃশ্য দেখে। কি বিভীষিকাময় সময়! লেখকের

দৃঢ় উচ্চারণ 'বিশ্বাসকে কখনো মারা যায় না,'[১৫] ঠিক তাই। এজন্য সেদিন নিরস্ত্র জনতা মরতে মরতে বাঁচার মন্ত্র শিখেছিল, হয়ে উঠেছিল এক একটা মৃত্যুঞ্জয়ী বীরপুরুষ। সংশপ্তকের দৃঢ়তায় পৃথিবীর অন্যতম সেরা সামরিক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল। ছিনিয়ে এনেছিল পরমপ্রিয়, পরম আরাধ্য স্বাধীনতা। সেই রাতে রাজারবাগ পুলিশলাইনের বাঙালি সদস্যরা সর্বস্ব দিয়ে লড়েছিল শত্রুর বিরুদ্ধে। সুদীপ্ত শাহিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে স্ত্রীর খালার বাড়ি পুরোনো ঢাকায় গিয়ে দেখে তারা বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিঞ্জিরায় চলে গেছে। ছোট ছোট তিন সন্তানকে নিয়ে কারফিউ এর মধ্যে বিপদগ্রস্ত স্বামী-স্ত্রী খালার পাশের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। আশ্রয়ও পেয়ে যায়। ঐ বাড়ির মেয়ে বুলা একটা গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য। এখন এরা কাজ করছে দেশের জন্য। এখানকার কর্মযজ্ঞ অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি সুদীপ্তকে আশাবাদী করে তুলে। উপন্যাসের শেষটুকু এমন:

> বাঙালির অস্ত্রের শক্তি আজ সীমিত হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার সম্পদ তো অফুরন্ত। সেই প্রীতি ভালোবাসার সঙ্গে এবার অস্ত্রের সম্মেলন হয়েছে - এবার বাঙালি দুর্জয়। ...
>
> . . .
>
> নব পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছে। পুরোনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটা প্রভাত। সে আর কতো দূরে। বেশি দূরে হ'তে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।[১৬]

লেখকের এই বিশ্বাসটা অবাক করে দেওয়ার মতো। বাঙালি তখন একতরফা মার খেয়ে যাচ্ছে পাকবাহিনীর কাছে। সবুজ-শ্যামল বাংলা বুটের তলায় পিষে গেছে। পথনির্দেশক নেতা শত্রুর কারাগারে অন্তরীণ। অথচ লেখক বলছেন 'মা ভৈঃ' মানে ভয় নেই, রাত কেটে যাবে। রাত সত্যি সত্যি কেটে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল আরও মাস ছয়েক পরে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বিনিময়ে দিতে হয়েছিল ত্রিশ লক্ষের অধিক তাজা প্রাণ, দুলক্ষের অধিক মা-বোনের সম্ভ্রম। কিন্তু লেখক আনোয়ার পাশার সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। যখন পাকবাহিনীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার অপপ্রয়াসে তালিকা করে বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু করে। ১৪ই ডিসেম্বর এই জাতি তাঁর মেধাবী সন্তানদের হারায় যাঁদের মধ্যে লেখকও ছিলেন। সৃষ্টিশীল মানুষেরা অলৌকিক আনন্দের ভারে বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন বলেই হয়তো অনেক দূর অব্দি দেখতে পান। তাই তো রক্তগঙ্গায় হাবুডুবু খেতে খেতে লেখক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন কিংবা বিশ্বাস করেছিলেন যে জাতি মরতে শিখেছে তাঁদের জয় নিশ্চিত।

মোট ১৮০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি ১৯টি অংশে বিভক্ত। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে টান টান উত্তেজনা। ২৫শে মার্চের রাত থেকে ২৮শে মার্চের রাত পর্যন্ত সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনের নামে শোষণের ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনা, যুদ্ধের বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে বিশদ কথাবার্তা রয়েছে। ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত পেরোনোর পর আখ্যানের শুরু। বেঁচে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ্ত শাহিনের জীবন ও মৃত্যু ভাবনা দিয়ে প্রথম অংশের নির্মাণ। তার স্মৃতিচারণে পাকশাসকদের সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডুকতা, ফুটে উঠেছে। 'পাকমুল্লুকে তরক্কির জন্য সুদীপ্তকে নাম লুকোতে হয়েছিল।'[১৭] অর্থাৎ প্রগতিশীল ও স্বাধীন চিন্তাকে গলা টিপে হত্যা করার প্রবণতা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মর্মকথা। আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মালেক সাহেবের প্রসঙ্গ। আয়ুব খানের ধ্বজাধরা। আখ্যানে হিন্দু-

মুসলিম সংকট তথা বাঙালি সংস্কৃতিতে হিন্দুদের আধিপত্য, ভাষা-আন্দোলন এসব অনুষঙ্গ এসেছে। মালেক সাহেবের ছোট ভাই খালেক সাহেবও একই পথের পথিক। এসবই স্মৃতিচারণ সুদীপ্তর। পরিসংখ্যানের শিক্ষক মনিরুজ্জামান ও ইংরেজির ড. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতার গুলি খেয়ে মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে এখানে। সুদীপ্ত বন্ধু ফিরোজের সঙ্গে ২৬শে মার্চ বের হয়ে এসব হত্যাকাণ্ড অবলোকন করে। লেখকের ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি, 'জেহাদের সওয়াব লাভে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাক-জওয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালিদের উপর। কয়েক লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিকে মারতে বেরিয়েছিল আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত বীর পুরুষের দল- পাকিস্তানি বীর পুরুষ।'[১৮]

ধ্বংসযজ্ঞ দেখে এধরনের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়। *The People, ইত্তেফাক* এবং *সংবাদ* এসব পত্রিকার অফিস হয় ধূলিসাৎ। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সৈনিকদের অসম সাহসিতার প্রসঙ্গ রয়েছে। হাসিম শেখ আমাদের সে খবর দেয়। জগন্নাথ হলের বেঁচে যাওয়া ছাত্রের মুখ থেকে সেই বিভীষিকার বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সবহারানো বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আমন শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যটাও হারিয়ে ফেলে। আরও উল্লেখ্য, 'শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সামরিক অফিসারদের জন্য একটি গণিকালয় স্থাপন করা হয়েছে।'[১৯] এভাবে পুরো আখ্যানজুড়ে রয়েছে টুকরো টুকরো বিশ্লেষণ, পাকবাহিনীর নির্মমতার রেখাচিত্র বাস্তবের ব্যক্তিমানুষদের মৃত্যুর উপাখ্যান। এটি আসলে পারিবারিক কাঠামোর গল্প। স্বাধীন বাংলা বেতারের খরচ আর মাভৈঃ বাণীতে আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুদীপ্ত শাহিনকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর নেশায় কবি- এই চরিত্রটির জীবনকে দেখার ভঙ্গিটি বিশেষ। এক উদার সংস্কৃতিমনা বৃহৎ হৃদয়ের মানুষ। যেন বাংলাদেশের মূল অনুভবটা তথা জাতীয় চেতনার রূপকার সে। তার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির বিশ্বাসকে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। 'এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প-প্রত্যয় আর স্বপ্ন-কল্পনারই যেন প্রতীক।'[২০] সুদীপ্ত শাহিন একবুক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। তাঁর আত্মবিশ্বাস আসলে মুক্তিকামী গণমানুষের আত্মবিশ্বাস। এখানে বাস্তবের অনেক মানুষকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। যারা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। যাঁদের আত্মাহুতির বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিছু পুলিশবাহিনীর সদস্য আর তাদের লড়াকু মনোভাব ঠিক এর পাশাপাশি চাটুকারের দল মালেক, খালেক সাহেবদেরও তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। আছে বামরাজনীতিকরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে। আছে আওয়ামীলীগ কর্মী আর বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ। এই জনপদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর অর্থনীতিক দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণে অনেক চরিত্রকে তুলে আনা হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে।

বেশিরভাগ প্লটের মতোই সরলরৈখিকভাবে অঙ্কিত এর আখ্যান। এই উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলা হয়, 'উচ্চতর শিল্প-কর্মের জন্য স্থান-কালের দূরত্বের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। আশ্চর্য, আনোয়ার পাশার জন্য তার প্রয়োজন হয়নি। যথার্থ শিল্পী বলেই এ হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ছাড়িয়ে পৌঁছতে পেরেছেন ঘটনার মর্মলোকে।'[২১]

এখানেই শেষ নয়, এই উপন্যাস, 'বাঙালির দুঃখ-বেদনা আর আশা-এষণার . . . এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্য-কর্ম হয়ে উঠেছে।'[২২]

এর ভাষা এবং শৈলীগত পরিচর্যা পাঠককে আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলে। চলিতরীতির গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সঙ্গত কারণেই এখানে উর্দু বাক্য এবং শব্দ এসেছে। যেমন : 'পাক মুল্লুকে তরক্কির জন্য সুদীপ্তকে নাম লুকোতে হয়েছিলে।'[২৩] পাকসৈনিকদের সংলাপে উর্দু এসেছে। যেমন: 'কুত্তাকা ঘার নেহি হ্যায়, চলো।'[২৪] –বাঙালিকে উদ্দেশ্য করে এভাবে কথা বলেছে তারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। সুদীপ্ত কলেজে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেলে বোর্ডের একজন সদস্য বলে, "মনে তো লয় যে, দরখাস্তে আপনি মিছা কথা বানাইছেন। সুদীপ্ত কি কখনো মুসলমানের নাম হয়?"[২৫] শ্রেণি, পেশা সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে ভাষা তথা চরিত্রের সংলাপ। সেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে, গদ্যে বিদ্রোহের এবং আশাবাদের সুরও আমাদের অভিভূত করে। যেমন:

> নিরস্ত্র মানুষ ব্যারিকেড দিয়ে গতি রোধ করবে কার? আধুনিক সেনাবাহিনীর? ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। . . . কিন্তু ফিরোজ হাসবেন কি ক'রে? এ তো খেলা নয়। অসহায় মানুষের বাঁচবার চেষ্টা। সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে গায়ের জোরে আমাদের গলায় আঙুলের চাপ কষতে শুরু করেছে ওরা। টুঁটি টিপে ধরলে মানুষ কতক্ষণ বাঁচে! বাধা দিতেই তো হবে। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু। দেশবাসী কি বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে মরবে।[২৬]

এভাবে বক্তব্যে প্রতিবাদ ফুঁসে উঠেছে। যুদ্ধোপন্যাস বলেই এর পরতে পরতে দ্রোহ, প্রতিবাদ আর আশাবাদকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শব্দের শক্তি অসাধারণ।

ভাষায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ:

> এক বিশাল আলবাট্রসের পাখার নিচে সমগ্র নগরী যেন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত।[২৭]

যা-ই হোক, টান টান উত্তেজনা নিয়ে বিভীষিকাময় সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের উপাখ্যান পাঠক অবিচ্ছিন্ন মনোযোগে পাঠ করে। 'সুদীপ্ত শাহীনের [শাহিন] অভিজ্ঞতার বীভৎস নগ্ন রূপ পাঠককে আতঙ্কিত ও শিহরিত করে সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ অবলোকনের অবিকল উন্মোচন জীবনের এক বস্তুসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।'[২৮] এই যুদ্ধোপন্যাসটির ঐতিহাসিক মূল্য তথা এর জীবনভাষ্যের মূল্য যথেষ্ট।

সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭) এর উপন্যাস *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬)। পটভূমি গ্রামীণজীবন ও পরিবেশ। বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম হলদী গাঁ। এই গাঁয়ের মেয়ে বুড়ি। একটু ভিন্ন প্রকৃতির বুড়ি। আর দশজনের মতো না– এই বুড়ির বেড়ে ওঠা, বিয়ে, সন্তান তথা জীবনের গল্পই বেশিরভাগ জুড়ে রয়েছে আখ্যানে। অতঃপর বুড়ির হলদী গাঁয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সাত মার্চের ভাষণ আকাশ-বাতাসে অনুরণন তোলে আর ব্যাকুল করে তোলে সহজ-সরল মানুষদের। একদিন শহরে সব হারিয়ে ঘরে ফিরে বুড়ির ছোটবেলার খেলার সাথী জলিল। মিলিটারি ক্র্যাকডাউনে স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়েছে সে। শোনায় মিছিলের নগরীর গল্প আর সেই রক্তে ভেসে যাওয়া রাজধানীর ভয়ঙ্কর উপাখ্যান। হলদী গাঁয়ের সহজ-সরল ভূমিসন্তানরা শপথ নেয় প্রতিশোধের। বুড়ির বড় ছেলে সলীম যুদ্ধে যায়। ছোট ছেলে কলীমকে চোখের সামনে হত্যা করে মিলিটারি। আর পাশের বাড়ির রমজান আলীর মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের বাঁচাতে নিজের গর্ভের সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন রইসকে তুলে দেয় শত্রুর হাতে। এমন আত্মত্যাগের গল্প *হাঙর নদী গ্রেনেড*।

মোট ১২৭ পৃষ্ঠার এই আখ্যানটি পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আখ্যানে জায়গা পেয়েছে বুড়ির ছেলেবেলা থেকে বেড়ে ওঠা, বিয়ে, স্বামী, সন্তানাকাঙ্ক্ষা, সন্তান লাভ, স্বামী বিয়োগ, সন্তানদের বড় হওয়া, বড় সন্তানের বিয়ে। এসব একটা গ্রামীণ আবহে শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে পারিবারিক জীবনের চিরন্তন চালচিত্র। এই জনপদের মানুষের আবহমান রূপ ও প্রকৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঠিক এমন পরিবেশে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধ। আখ্যানে সাড়া পড়ে যায়। ঢাকা থেকে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ইথারে ভেসে আসে রক্তদানের গল্প। লেখক বলছেন, 'বুড়ি হলদী গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনুভব করে হলদী গাঁয়ে চিরকালীন শান্ত সংঘাত কর্মপ্রবাহে জোয়ার এসেছে। মুখ বুজে সয়ে যাওয়া, ঘা খেয়ে মাথা নোয়ানো মানুষগুলোর কণ্ঠে এখন ভিন্ন সুর। চোয়ালে ভিন্ন আদলের ভঙ্গি।'[২৯]

হলদী গাঁয়ের সহজ-সরল মানুষগুলো ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তায় সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। আখ্যানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শহরে সব হারিয়ে ফেরত আসে জলিল। পৌঁছে দেয় রক্ত গঙ্গায় ভেসে যাওয়া ২৫শে মার্চের কালরাতের খবর। প্রতিশোধের আগুনে নিজেদের শুদ্ধ করে তৈরি করতে থাকে হলদী গাঁয়ের মানুষেরা। অবশ্য বিপরীত চেতনার মানুষ ছিল না তা কিন্তু নয়। প্রেরণা যোগায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যা রেডিওর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছায়। আমরা জানি এই ভাষণ যারা শুনেছে তারা সকলেই অন্য মানুষ হয়ে গেছে। হলদী গাঁও এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধের উত্তেজনা কীভাবে হলদী গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার উপস্থাপনা নান্দনিকতায় ভরপুর।

> চোত মাসের দশ তারিখ ওদের কমদামী ট্রানজিস্টারে করে ঢাকার খবর এলো। মিলিটারি নেমেছে ঢাকার পথে। তখন চৈত্রের আকাশ মুঠো মুঠো রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঠেঘাঠে। রমিজা গরম ভাত নামিয়েছে চুলো থেকে। আর সলীম চেঁচাচ্ছে। একটি অখ্যাত, অবজ্ঞাত ছোট্ট গ্রাম হলদী গাঁয়ের সলীম চিৎকার করছে ক্ষোভে, আক্রোশে। বুড়িকে ধরে ঝাঁকুনি দেয় কয়েকটা। শপথ নেয় অদ্ভুত বলিষ্ঠকণ্ঠে।[৩০]

চৈত্রের রোদ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে। গরম ভাত চুলো থেকে নামছে ঠিক এমন পরিবেশে যুদ্ধের খবর ঢুকে পড়ছে আখ্যানে আর দৃপ্ত শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে বাংলামায়ের দামাল ছেলে সলীম। এমন অদ্ভুতভাবেই সেদিন যুদ্ধ এসে কড়া নেড়েছিল সজোরে আমাদের শান্তির জীবনে। হলদী গাঁয়ে কুটুম পাখি ডাকে। এই 'কুটুমের আগমনে উল্লাস নেই, কেমন একটা থিতানো ভাব। এই কুটুমের জন্যে পিঠে পুলির উৎসব নেই। বরং জল ঢেলে চুলো নিভিয়ে লুকিয়ে থাকা।'[৩১] মিলিটারি তাদের সকল নৃশংসতা সঙ্গে নিয়ে সারা দেশের মতো তছনছ করে দেয় হলদী গাঁ। পোষাপ্রাণী বধ, নারী হরণ, ঘরে আগুন দেওয়া, যুবক ছেলেদের হত্যা কিছুই বাকি থাকে না। এসব করে এলাকার মনসুর মেম্বারের সহায়তায়। বুড়ির বড় ছেলে সলীম যুদ্ধে যায়। মেজ ছেলে কলীমকে ঘর থেকে বের করে এনে চোখের সামনে হত্যা করে মিলিটারিরা। আর পাশের বাড়ির রমজানের মুক্তিযোদ্ধা দুই ছেলেকে বাঁচাতে বুড়ি ছোট ছেলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী রইসকে তুলে দেয় মিলিটারির হাতে। বুড়ির সই নীতা বলে, 'সই চল, দেখবি না বুক পিঠ কেমন ঝাঁঝরা হয়েছে? রক্তে মাখামাখি হয়ে কেমন পদ্মের মত ফুটে আছে তোর রইস?'[৩২] ঠিক তাই। ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ এভাবেই পদ্মের মতো ফুটে আছে আজও আমাদের হৃদয়ে। আখ্যান শেষ। বুড়ির আত্মত্যাগ আর যুদ্ধের বিভীষিকাময়তায় ভরা এই আখ্যান। ক্লাইম্যাক্স

একদম শেষে বলা যায়। শান্তস্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশে যুদ্ধের উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট বীভৎসতার মধ্যে বেশ একটা বৈপরীত্যের আর্বতে আখ্যানের নির্মাণ চিত্তাকর্ষক।

এই আখ্যানের চরিত্রায়ণেও বিশেষ পরিচর্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র বুড়ি এই উপন্যাসের প্রাণ। সে যেন সবুজ শ্যামল বাংলার প্রতীক। তার সাথে হলদী গাঁকে সমর্থক করে অঙ্কন করা হয়েছে। একটু ভিন্ন ধাঁতে গড়া সে। গড়পড়তা আর দশটা গ্রামীণ মেয়ের মতো নয়। জীবনকে নিয়ে তাঁর ভাবনাটা আলাদা। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের জীবনকে নিয়ে আখ্যানের অর্ধেকটা তৈরি। যুদ্ধ যখন আখ্যানে ঢুকে পড়ে তখন বুড়ির জীবনের পড়ন্ত বেলা। বুড়ির উৎসাহ বাড়ে গ্রামের ছেলে বুড়োর উৎসাহ দেখে। প্রতিশোধের স্পৃহা তার মধ্যেও কাজ করে। এমনি মরবো কেন, লড়াই করে মরবো। এই বোধ তৎকালীন কমবেশি সকলের মধ্যেই কাজ করেছিল। বুড়ির দৃপ্ত উচ্চারণ, 'যারা ভাইয়ের বুকে গুলি চালায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকি না রে।'[৩৩] বুড়ির এই চিন্তায় সে হয়ে উঠে লড়াকু মানুষের প্রতিনিধি। তার আত্মত্যাগ তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আত্মত্যাগ। নিজের সন্তানদের পদ্মফুল হতে দেখে বুড়ি। দেশকে রক্ষার জন্য দেশের প্রতি ভালোবাসার জন্য গ্রামের এক অশিক্ষিত নারী যে দর্শন, ভূগোল, রাজনীতি কিছুই জানে না তার আত্মত্যাগ তার ভাবনা আমাদের অবাক করে। সময়ের প্রয়োজনে বুড়িরা হয়তো বা তৈরি হয়। আর তাদের নির্মাণ করেন ভাষার সৌকর্যে কথাশিল্পীরা। গফুর বুড়ির চাচাতো ভাই। বিপত্নীক গফুর দুই ছেলের বাবা। বিয়ে হয় বুড়ির সঙ্গে। বয়সের ব্যবধান অনেক। গফুরের মধ্যে সাধাসিধে একটা ব্যাপার আছে। বুড়ির মতো করে জীবনকে বর্ণিলভাবে ভাবতে পারে না সে। আরেকজন হচ্ছে জলিল। বুড়ির ছোটবেলার খেলার সাথী। সেও গফুরের মতো বুড়িকে বোঝে না। জীবনকে দেখে সাদা চোখে। আর বাকি যারা আছে সলীম, কলিম, রমিজা, বৈরাগিনী, রমজান আলী, কাদের, হাফিজ, রমিজার বাবা এরা আখ্যানে সকলেই বুড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বুড়ি এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। নীতা বৈরাগিনী অবশ্য আখ্যানে বুড়ির অপরিচিত জগৎ তথা হলদী গাঁর বাইরের পৃথিবীকে নিয়ে আসে। একটা ভিন্ন আবহ তৈরি হয় তার উপস্থিতিতে গ্রামে। এই চরিত্রটি মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপৃত পরিসরকে তুলে ধরে।

এই উপন্যাসের ভাষায় অদ্ভুত এক স্নিগ্ধতা কাজ করেছে। গ্রামীণ প্রকৃতিতে বিনির্মিত আখ্যানের ভাষায় সবুজ-শ্যামল বাংলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। যেখানে যুদ্ধ এসে ভীড় করে তার সমস্ত নারকীয়তা নিয়ে। লেখকের বর্ণনায়:

> আজকাল প্রতিদিনই নতুন মনে হয় বুড়ির। . . . বাঁশবনের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকঝাঁক বালিহাঁস উড়ে যায়। উঠোনে ছায়া পড়ে। অসম্ভব সুন্দর হলুদ গলাটা সকালের রোদের মত লাগে। কোথায় যেন আলগা রঙে ঝরণা বইছে। অথচ, ধরতে পারছে না বুড়ি। সে রঙ এবার বন্যা হবে। সে বন্যা নতুন পলিমাটি বয়ে আনবে। উর্বরা শ্যামল মাটিকে ঐশ্বর্যশালী করবে। বুড়ি খালের ধারে যায়। মনে হয় মৃদু-স্রোতের ছোট খালের শরীর বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পানির রেখা; জলের বুকের কেলি। বদলে যাচ্ছে সবুজ শ্যাওলার মাথা নাড়া, পারের মাটির সখী-খেলা। বদলে যাচ্ছে মাটির গতর। হৃৎপিণ্ডে ধুক্‌ধুক্ শব্দধ্বনি। কেমন যেন উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে খালের শরীর। চিরকালের চিরচেনা নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা খালটা কত দ্রুত পাল্টে গেল। যেন বাঁক বদলাতে চায়, যেন স্রোতে বিশাল কিছু বয়ে আনতে চায় কিংবা দু'কূল ভাসিয়ে সাগরে যেতে চায়।[৩৪]

এই বর্ণনায় আমরা দেখি গ্রামীণ স্থির পরিবেশে কীভাবে বদলের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। লেখকের ভাষার সৌকর্যে আমরা বিমোহিত হই। গল্পের পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলে 'গতর' শব্দটির প্রয়োগ। মুক্তিযুদ্ধের অনেক লেখায় কুকুরের একটানা আর্তনাদের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানেও তা আছে। যেমন: বুড়ির বাড়িতে থাকা কুকুর বাঘাকে সে বলে- 'তোর এত অস্থির লাগে কেন বাঘা? তোর কি হয়েছে? তুই কি কিছু বুঝতে পারিস?'[৩৫] এরকম প্রতীকী উপস্থাপনা এখানে 'কুটুম পাখি'র মধ্য দিয়েও করা হয়েছে। যার ডাকে এমন কুটুম আসে যারা জীবনকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। গ্রামীণ আবহে এমন উপকরণে সুসজ্জিত *হাঙর নদী গ্রেনেড* এর শরীর। সমালোচকের ভাষায় দেখি:

> সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামীণ জীবনের আবেগী চিত্ররূপ। বুড়ির মাতৃ-ইমেজ হলদী গাঁয়ের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে সমগ্র বাংলাদেশেই প্রসারিত করে দেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। গ্রামীণ জীবন-কাঠামো, যুদ্ধের অভিঘাতে তার রূপান্তর চরিত্রসমূহের বাস্তবানুগ ক্রিয়াশীলতা এবং সর্বোপরি বুড়ির আত্ম-উজ্জীবন এ উপন্যাসের জীবনদর্শনকে করেছে সমগ্রতাস্পর্শী।[৩৬]

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)-এর *জলাংগী* উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৩ সাল। মেঘনা তীরবর্তী বাঁকাজোল গ্রামের কাহিনি এটি। ঢাকায় পড়ুয়া জামিরালি উত্তাল মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় গ্রামে চলে আসে। তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কয়েক মাস পর বাড়িতে কিছু না বলে বাড়ির একমাত্র সন্তান যুদ্ধে চলে যায়। মাঝে ফিরে এসে দেখে বাবা-মা নেই। বাঁকাজোল গ্রামটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। প্রিয় নারী হাজেরাকে খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে পাকবাহিনীর হাতে। তারপর মর্মন্তুদ শাস্তিভোগ এবং মৃত্যু লাভ। মেঘনার স্রোতে ভেসে যায় হাজেরা আর জামিরালি। মোট নয় অধ্যায়ের ক্ষীণকায় এই উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র তেত্রিশ। গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে আগের উপন্যাসটির মতো। বাঁকাজোল গ্রামের ফয়েজ মৃধা ও নাসিমন বিবির শহরপড়ুয়া একমাত্র সন্তান ঢাকা ছেড়ে গ্রামে আসে। পাঠকও তার সাথে সাথে গ্রামে প্রবেশ করে। শান্ত-স্থির প্রকৃতির লীলাভূমি গ্রামে সে যেন উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে আসে। জানায় ঢাকা শহরের উত্তাল অবস্থার কথা। যদিও গ্রামের মানুষজন ট্রানজিস্টারের বদৌলতে অনেক কিছুই জেনে গেছে। শহর ফেরত জামিরালি তার বাবা মাকে শোনায়, "তুমি সব বুঝবে না, মা। পাঞ্জাবিগো লগে আমাগো লড়াই লাইগব যদি ছ-দফা-হে তুমি বুঝবে না হেরা যদি আমাগো ব্যবসাবাণিজ্য চাকরি এসব না দেয়। হব তো তাগোর পেটে।"[৩৭] খুব সহজভাবে এই সংলাপে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের বঞ্চিত হওয়ার গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই আমরা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেখি মেঘনাতীরবর্তী বাঁকাজোল গ্রামটিতে। *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাস যেমন গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ পরিবেশে ইথারে ভেসে বিভীষিকাময় দিন তার আগমন জানিয়েছিল এখানেও এমনটা ঘটেছে।

মেঘনার নদীর স্বভাব আর ব্যক্তিমানুষের জীবনে তার প্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক, সঙ্গে গেঁথে চলেছেন এক মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাসে ভরা ভয়াবহ দিনের কথা। প্রথম অধ্যায়েই জামিরালির প্রিয় নারী হাজেরার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। জীবন যেন স্বরূপে আবির্ভূত এখানে তার সমস্ত আবেদন নিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দেশবিভাগ, তথাকথিত স্বাধীনতা নিয়ে হা-হুতাশ আখ্যানে জায়গা করে নেয়। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ পরবর্তী

প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের যা কিছু আছে তা নিয়ে লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা এই বাঁকাজোল গ্রামেও দেখা যায়। যুদ্ধ বাঁধে। অনেকের মতো জামিরালিও যুদ্ধে চলে যায়। আছে দালালদের প্রসঙ্গও। পাঁচ মাস যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে বাবা-মার খবর নিতে জামিরালি বাঁকাজোলে এসে দেখে–

> রিক্ত গ্রাম। কিন্তু হৃদেয়র ঐশ্বর্যে অঢেল। . . . আগুন সবগ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। বুকের উত্তাপ তারি খেসারৎ মেটাতে লেলিহান শিখা।
> জামিরালির বাড়ি বলতে আর কিছু নেই।[৩৮]

তার মৃত বাবা-মার কবরও জোটেনি। জনৈক বর্ষীয়ান বলে, 'ইসলামি রাষ্ট্রে হৈছিল, বা-জান। নসিবে কবরও লেখা নাই।'[৩৯] ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের এবং পরিচালনার অন্তঃসারশূন্যতাকে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ অকৃত্রিমভঙ্গিতে তুলে ধরে। সব হারিয়ে জামিরালি প্রিয় নারী হাজেরার খোঁজে কাজির চর গ্রামে গেলে ধরা পড়ে রাজাকারদের হাতে। সেখান থেকে মেজর হাশেমের টর্চার সেলে। খুব কৌশলে আখ্যানে ঢুকে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের কালো অধ্যায়গুলো। টর্চার সেলের নির্মমতা, নারীর প্রতি চরম সহিংসতা উপস্থাপিত হয়। এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে বন্দি হাজেরার সাথে বন্দি জামিরালির দেখা হয়। তারপর তাদের বাধ্য করা হয় মানে অত্যাচারের অংশ হিসেবে যৌন মিলন করতে। এবং পরবর্তীতে এর অপরাধে মেজর হাশেম জন আদালতে তাদের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড স্থির করে। হাত-পা বেঁধে 'আট দশসের' ওজনের পাথর তাদের গলায় ঝুলিয়ে মেঘনায় নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। জীবন্ত সলিলসমাধি। রাক্ষুসে মেঘনার গর্জনে তাদের 'জয়বাংলা' ধ্বনির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায়। মেঘনার সাথে গ্রামীণ মানুষের সম্পৃক্ততা দিয়ে আখ্যানের শুরু এবং তাতে মুক্তিযোদ্ধা জামিরালি ও মিলিটারির হাতে সম্ভ্রম হারানো নারী হাজেরার মেঘনায় সলিলসমাধি দিয়ে শেষ। নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবনে এর প্রভাব আর সম্পৃক্ততা, সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক, হৃদয়ের সংগোপনে জমে থাকা অনুরাগ, পারিবারিক আবহ আর এসবের সাথে যুদ্ধে তাণ্ডব, বীভৎসতা, নির্মমতার প্রায় কমবেশি সবদিক এখানে আছে। এসবের সঙ্গে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কথায় এই উপন্যাসের শরীর নির্মিত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনেরও সারল্যকে ছাপিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি যে জটিল আবহ তৈরি করে সেটার উপস্থাপনাও এই আখ্যানের বিশেষত্ব।

আসলে একাত্তরের বাংলাদেশ পুরোটাই একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এর প্রতিটি মানুষ আর প্রতি ইঞ্চি ভূমি সেদিন আক্রমণের শিকার হয়েছিল। আখ্যানের নামকরণে মেঘনার জলপ্রবাহকে প্রতীকায়িত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর চরিত্রায়ণে জটিলতা কম তথা সরলরৈখিক একটা ব্যাপার রয়েছে। জামিরালিকে কেন্দ্র করে আখ্যানে অন্যরা আবর্তিত হয়েছে। স্নেহে, মায়ায়, প্রেমে, প্রতিবাদে আর সাহসিকতায় ভরপুর তরতাজা যুবক জামিরালি। দেশের দুর্দিনে সে ঘরে বসে থাকেনি। বাবা-মায়ের স্নেহের পাশ অতিক্রম করে দেশমাতৃকার টানে রাতের অন্ধকারে আগরতলার উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছিল। সেদিন এমন ঘটনা কমবেশি সব ঘরেই ঘটেছিল। ছাত্র কলম ফেলে অস্ত্র ধরেছিল, দুর্বৃত্তরাও অনেকে নিজস্বার্থে ধরা অস্ত্রকে দেশমাতৃকায় রক্ষায় ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই উপন্যাসে ডাকাত জাফর হয়ে যায় জাফর মিয়া- দেশকে ভালোবেসে। একটা যুদ্ধ মানুষকে আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। অকুতোভয় জামিরালি মিলিটারির টর্চারসেলে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করলেও কখনোই ক্ষমা ভিক্ষা করে না। এই চরিত্রের মধ্যদিয়ে তৎকালীন সাহসী মানুষকে উপস্থান করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যারা শত

প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছিল এবং জীবন বাজি রেখে দেশকে শত্রু মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল।

গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনীতিসচেতন মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। তাদের সংলাপে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। হাজেরার মতো নারীদের ধরে নিয়ে ক্যাম্পে যে অত্যাচার চালানো হয় তা সমস্ত আদিমতাকে ম্লান করে দিতে পারে। অন্যদিকে বলা যায়, "গণচেতানার জোয়ার ধরে মুক্তিযুদ্ধের উন্মাতাল আহ্বান গ্রাম-বাংলার মানুষের বিবেককে শাণিত ও শোণিতাক্ত করেছিল। *জলাংগী*তে শওকত ওসমান রূপদক্ষ শিল্পীর মত এই চিত্র অঙ্কন করেছেন।"[৪০] রাজাকার তথা দালালদেরও দেখা যায়। আর মিলিটারিদের সমস্ত নৃশংসতাকে ধারণ করে আছে মেজর হাশেম। এভাবে একটি দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পুরো যুদ্ধ পরিস্থিতির একটা চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

জলাংগী উপন্যাসের ভাষাশৈলীতেও বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। দ্রোহের চেতনাকে দীপ্তিময় করেছে শাণিত শব্দের যথাযথ ব্যবহার। 'অপারেশন সার্চলাইট' এর ফলে আক্রান্ত ঢাকাকে নিয়ে লেখকের মন্তব্য:

> খবর নয় মানবেতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের পাতা থেকে পাঠ। সভ্যতা নির্মর্জিত[নিমজ্জিত]। যুগযুগান্তরের সংস্কৃতির সকল অবদান ঢাকা শহরে পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তানি শাসকেরা ডুবিয়ে দিয়েছে। অরণ্যের যূথচারী জন্তুবৃন্দ খাকি উর্দি-পরিহিত, মারণাস্ত্রে নখর-সজ্জিত বেরিয়ে এসেছে তাদের ইসলাম-মার্কা মধ্যযুগীয় গুহা থেকে। হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম এই তিন শব্দের চরমতম রূপ ঢাকা-নগরীর পথে ঘাটে পল্লীতে পল্লীতে বাস্তব আকার নিয়েছিল। আর্তনাদ আর আর্তনাদ নয়, রক্ত আর রক্ত নয়।[৪১]

চিত্ররূপময় গদ্যেরও প্রয়োগ লক্ষ করা যায় মেঘনার বর্ণনায়। যেমন:

> বিস্তীর্ণ জলরাশির প্রবাহ একেক সময় লয় থেকে লয়ান্তরে যায়। . . . গ্রীষ্মে যখন ধু-ধু চর পড়ে ক্রোশের পর ক্রোশ, সদা হাহাকারে দুপুরে ঝলমল, তখনো আঁকাবাঁকা সর্পিলতায় নদীর প্রাণস্ফূর্ততা লেখা হয়। . . . আকাশ-তটে অনেক মেঘ জমলে ভরা মেঘনা যেন অভিমানী কুলবধূ, আক্রোশে কাঁখের গাগরি আছড়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছে এবং তারই ঝংকার আসছে থেকে থেকে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার। বহু দিনের নদীতীরবাসী-কে জলতরঙ্গের যাতায়াতের ছন্দ রক্তেও জায়গা দিতে হয়।[৪২]

চিহ্নিত অংশে চিত্রকল্পের প্রয়োগ উল্লেখ করার মতো। এখানে গ্রামীণ পটভূমিতে আখ্যান নির্মিত বলে সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। আবেগের তীব্রতায় ভাষা মুখর হয়েছে। প্রেয়সীকে ভাবতে গিয়ে জামিরের উদ্বেলিত আবেগ রূপায়িত হয়েছে এভাবে:

> গোধূলির আবছা অন্ধকার সহসা আলিঙ্গন-উন্মুখ বুকের মতো নিঃশ্বাসে উদ্বেলিত হয়। জামির আর কাউকে বুকের কাছে টানার জন্যে এক হাত বাড়িয়ে দিলে। তক্তপোষের উপর পাতা মাদুরের অল্পমসৃণ সমতল বিদ্রূপের মতো হঠাৎ যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল। তারি ঝন্‌ঝনায় নদী উথালপাতাল করে। রাগী স্রোতের ক্যারাভান খড়কুটো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, নৌকার তলায়, তটে আক্রোশে ভেড়ে [ভেঙে] পড়েছে অজস্র শব্দের বিদীর্ণতায়।[৪৩]

এভাবে নান্দনিক হয়ে উঠেছে এর ভাষা। এই উপন্যাসের আঙ্গিকগত পরিচর্যায় লেখকের সযত্ন প্রয়াস আমাদের গোচরীভূত হয়।

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) এর *কাছেই সাগর* (২০০৭) উপন্যাসে দেখা যায় মতিঝিলের কেরানিপাড়ার সরকারি কোয়ার্টারের মানুষদের মধ্যে আটষট্টি, ঊনসত্তর, সত্তর, একাত্তর কীভাবে কড়া নাড়ে। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের জননী বেনু। স্বামী কেরানি আলতাফ। এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র সংযুক্ত হয়ে যায়। সংযুক্ত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নগরকেন্দ্রিক জীবনে মধ্যবিত্ত মানুষের মনে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার গল্প এটি।

মোট তিন অংশে বিভক্ত ৬৫ পৃষ্ঠার উপন্যাস *কাছেই সাগর*। এ উপন্যাসের গল্পবয়ানে অভিনবত্ব রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী আটষট্টি থেকে একাত্তর সময়ের কথা লেখকের জবানিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর পরিচিত এক লড়াকু নারী বেনুর গল্প। মধ্যবিত্তের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর মায়া-মমতায় ভরা সংসারে এই জাতির ইতিহাস তৈরির সময় ঢুকে পড়ে। সজোরে কড়া নাড়ে তাদের যাপিত জীবনে। বুকের মধ্যে তৈরি হয় দ্রোহ। প্রিয় হয়ে ওঠে দেশ, আর অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বর্ষিত হয় ঘৃণা। ভূমিকার পর আখ্যানের প্রথম অংশের নাম 'বেনুর গল্পের শুরু'। বেনুর টানাপোড়েনের সংসারে শখ জেগেছে ঢাকা শহরে এক চিলতে জমি কেনার। নিজের একটা ছোট্ট ঘর তুলবে সে সেখানে। পকেটে পয়সা না থাকায় কেরানি স্বামী আলতাফ সে স্বপ্ন দেখতে বারণ করে। বন্ধুর বইয়ের দোকান থেকে একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে এসে ঘরে টাঙায় আলতাফ। ক্যালেন্ডারের ছবিটা ছিল নীল সমুদ্রের। লেখক বলছেন, "বিস্ময়ে মুগ্ধতায় অভিভূত বেনু, সমুদ্র এত সুন্দর! এমন আশ্চর্য নীল, ঢেউয়ের সারির মাথায় কাশফুলের মতো ফুটে থাকে এমন সাদা ফেনা!"[৪৪] বেনুর চেতনাজুড়ে যখন সমুদ্রের নেশা তখন রাজপথে মিছিল যায় "আগরতলা ষড়যন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। ... আমাদের দাবি মানতে হবে ..."[৪৫] এবং এখানেই শেষ নয়, লেখক বলছেন:

> বেনুর খুব আশ্চর্যভাবে মনে হয়, মিছিল থেকে উঠে আসা গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে তার অভাবের সংসারের বিবর্ণ ঘরে। তখনই হাওয়ায় ভীষণ দোল খায় ক্যালেন্ডারের ছবি, যেন ক্ষোভে আক্রোশে উত্তাল হয়ে উঠেছে নীল সমুদ্র। মিছিলের শ্লোগান নয়, গর্জন করছে ছবির পৃষ্ঠায় বন্দি সাগর। ছুটে আসে বেনু, ছবিতে হাত রেখে থরথর করে কাঁপে, বিমূঢ় ঠোঁটে বিড়বিড় করে- সাগরটা কি সত্যি সত্যি জীবন্ত হয়ে উঠেছে ![৪৬]

প্রতীকায়িত উপস্থাপনা। সাগরের প্রতীকে মিছিলের উন্মাদনা তথা রাষ্ট্রযন্ত্র তার রাজনীতি নিয়ে বেনুর সংসারে ঢুকে পড়ে। ঢাকা শহরের উত্তেজনা ছুঁয়ে যায় বেনু আর আলতাফকে। না, শুধু তাদের নয়–তাদের মতো কেরানিপাড়ার আরও অনেককেই। ওদিকে সংসারে দাম্পত্যকলহ তুমুল হয়ে ওঠে যখন বেনু সমুদ্র দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। কারণ আলতাফ তার জমানো টাকা পিতৃহীন ভাগ্নির বিয়েতে খরচ করে ফেলে। সেই সংকটেরও একটা সমাধান খুঁজে তারা। আখ্যানের পরবর্তী পর্বের নাম 'বেনুর গল্পের মধ্যপর্ব'। এখানে বেনু সমুদ্রদর্শনের স্বপ্নে বিভোর। বেনুর চেতনায় ঘা মেরে যায় মিছিলের শ্লোগান, "আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলা–নিপাত যাক, নিপাত যাক। গণতন্ত্র মুক্তি পাক, মুক্তি পাক। জালেম মোনেম তফাৎ যাও। ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দাও।"[৪৭] স্বামী আলতাফের হাত ধরে বেনুর সংসারে দেশের অরাজক অবস্থার গল্প ঢুকে যায়। এসব দেখে ভয় পাওয়া আলতাফ এখন বলে, ". . . এটাই সত্যি, ভয় পেয়েছিলাম। বেশি ভয় দেখাতে থাকলে ভয়টা কিন্তু আর থাকে না। কেটে যায়।

মানুষ বেপরোয়া হয়, সাহসী হয়ে ভয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আমিও আর ভয় পাই না।"[৪৮] এদেশের সহজসরল মানুষরা কীভাবে সাহসী হয়ে উঠেছে এই আখ্যান সে গল্পও শোনায় আমাদের। বেনুদের সংসারে ছাত্রনেতা আসাদের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বেশ আবেগের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অবস্থায় বেনুর মনে নিজস্ব দুঃখ আবার ধ্বস নামায়। আলতাফকে ছোট ভাইয়ের চাকরির জামানত হিসেবে সমুদ্র দেখতে যাওয়ার জন্য জমানো টাকাটা দিয়ে দিতে হয়। কলহের অবসানের পর বেনু আবার নতুন উদ্যমে টাকা জমাতে শুরু করে। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুতে সারা দেশের সাথে এই পরিবারের সদস্যদেরও ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায়। বেনুর চুলোর আগুনে বিদ্রোহের ছাপ ফুটে ওঠে। খবর আসে ড. শামসুজ্জোহাকে খুন করার। লেখক বলছেন:

> মেঘ নামে শহরে ...। তারপরই ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ, জ্বলে ওঠে আগুনের ধারালো শিখার ঝলক। পথে নামে মানুষ। মিছিলের গর্জনে বিদীর্ণ হয় ঢাকার আকাশ। রাজপথে হাজার মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে গুঁড়িয়ে যায় অস্ত্রধারী সরকারের সান্ধ্য আইন। . . . ভেসে যায় আগরতলা ষড়যন্ত্রের কুচক্রী মামলা। ভেসে যায় সরকারের প্রশাসন যন্ত্র। ঊনসত্তরের [ঊনসত্তরের] ফেব্রুয়ারি বিজয়ের উচ্ছ্বাসে উত্তাল। জয়ের আনন্দে বাঁধভাঙা মানুষ ঘর ছেড়ে নামে পথে। রাতের আঁধার মুছে দেয় মশাল মিছিল।[৪৯]

এভাবে আখ্যানে লেখক এক মধ্যবিত্তের পারিবারিক কাঠামোয় গেঁথে চলেন উত্তাল রাজনৈতিক আবহকে। একসুরে মিলিয়ে দেন। এই আখ্যানের পরবর্তী পর্ব 'অন্তপর্বের ভূমিকা'। বেনুর সমুদ্র যাত্রায় আবার বাধা পড়ে। গর্ভে আসে তৃতীয় সন্তান। সাত মাসেই তার জন্ম হয় জমানো সব টাকা মুহূর্তে উড়ে যায়। শরীর ভেঙে পড়ে বেনুর। আবার ভেঙে পড়া মন নিয়ে বেনু সমুদ্র দর্শনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এবং আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন আলতাফের মা অসুস্থ। মায়ের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় আলতাফকে। সমুদ্র দেখতে যাওয়ার তারিখ পার হয়ে যায়। আখ্যানের শেষ অংশের নাম 'বেনুর গল্পের অন্তপর্ব'। আলতাফের ক্যান্সার রোগগ্রস্ত মা পাঁচমাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মারা যায় একাত্তরের মার্চে। মাকে দাফন করে ঢাকায় ফেরার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আলতাফ। কারণ ২৫শে মার্চের কালরাতে সে পথে নেমেছিল। সে রাত ছিল মানব ইতিহাসের জঘন্যতম রাতের একটি। ওদিকে আখ্যানে সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, নির্বাচন, ৭ই মার্চ এবং একাত্তরের গণহত্যা সব জায়গা করে নেয় অতি সন্তর্পণে। বেনু তিন সন্তানকে নিয়ে মতিঝিলের কলোনিতে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে একসময় পথে নামে এবং নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এভাবে অসংখ্য মানুষের হারিয়ে যাওয়ার অলিখিত গল্পকে বেনু-আলতাফের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন লেখক। সেদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা এভাবে হারিয়ে গিয়েছিল বলেই স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণকে পেয়েছি আমরা। আখ্যান শেষ হয় বেনুর প্রতীকায়িত ফিরে আসার কথা দিয়ে। অর্থাৎ বেনুর তৈরি একটি নকশিকাঁথা লেখকের হাতে আসে। বলেন:

> কাঁথা কোথায়! এ যে এক নীল সমুদ্র। এমন আশ্চর্য, অসাধারণ সুচি-শিল্পটি কখন, কেমন করে তৈরি করল বেনু! বিরাট কাঁথাটি জুড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সাদা ফেনা পুঞ্জ নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ। সেই উত্তাল ঊনসত্তরে [ঊনসত্তরে], সেই গর্জে ওঠা সত্তরে যখন বেনুর দু-চোখে থাকত নীল সাগরের ছবি আর ঘরে বসে কাঁথায় সুচের ফোঁড় তুলত বেনু, তখন কে ভেবেছিল তাঁর কাঁথায় জাগ্রত এক বাংলাদেশের ছবি আঁকছে! বাংলাদেশ-ই তো! কাঁথার ঠিক মাঝখানে লাল-সবুজ সুতোর কারুকার্যে বেনু লিখে গেছে 'বাংলাদেশ' নামটি। নাম নয়

> যেন সাগরের ঢেউ ছোঁয়া, রক্তিম গোধূলি মাখা সবুজ দ্বীপ। আর ঠিক তার পাশেই কোনাকুনি করে লেখা 'বেণ, ১৯৭০'।[৫০]

বেনুর সংগ্রাম অনেকটা রূপকায়িতভাবে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে তুলে ধরেছে। বেনু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি- নিজেই হারিয়ে গেছে একাত্তরের রক্তের সমুদ্রে ভাসা বাংলাদেশে। আর এই আখ্যানের অভিনবত্ব হচ্ছে লেখক উত্তমপুরুষে একজনের কাছ থেকে শোনা বেনুর জীবনকথাকে উপস্থাপন করেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সংকটকে ভাষাদানে তাঁর কার্পণ্য নেই। এবং একইরকমভাবে এদেশের ইতিহাস নির্মাণের উত্তাল এবং বিষণ্ন সময়টাকে এই গল্পের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে জুড়ে দেন। যেটা প্রমাণ করে গণমানুষের চেতনায় ঘা দিতে পেরেছিল তৎকালীন প্রতিবাদ। ফলে এটি সোচ্চার হয়ে তীব্র রূপ লাভ করতে পেরেছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একই অনুভবে জারিত হয়েছিল বলেই জন্ম নিয়েছিল লাল সবুজের বাংলাদেশ।

এই উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণে সরলরৈখিক ফর্মকেই অবলম্বন করা হয়েছে। বেনুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সবাই। বেনুর মতো অল্পশিক্ষিত একজন কেরানির স্ত্রী কী করে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে সেটারই বর্ণনা করা হয়েছে। তার অনন্যতা তার ভাবনার গভীরতায় নিহিত। মিছিলের শ্লোগানে মুখর চারপাশ তার টানাপোড়েনের সংসারে এসে উঁকি মারে সগৌরবে। দেয়ালে টাঙানো নীল সমুদ্রের ছবি উত্তাল হয়ে ওঠে। সে হাত দিয়ে তা ধরে রাখে এবং তার কাঁপুনি অনুভব করে। বলে "সাগর, আবার কখন জেগে উঠবে তুমি? আমি তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখতে চাই। তোমার গর্জে ওঠায় খুশি হতে চাই।"[৫১] বৃত্তবন্দি বেনু সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সংবাদে "বেনুর ছোট্ট রান্নাঘরে কেরোসিন স্টোভে টগবগিয়ে ফোটে ডাল। ডালে সুঘ্রাণ পায় না বেনু, পায় যেন পোড়া গন্ধ। বারুদের গন্ধ . . . দেখতে পায় কেবল আগ্রাসী আগুন।"[৫২] এখানেই শেষ নয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার অনুভবও গভীরতলসঞ্চারী। সর্বোপরি তার সমুদ্রদর্শনের জন্য লড়াই যেন অসচ্ছলতার বিরুদ্ধে শুধু লড়াই নয়, দারিদ্র্য এখানে স্বৈরাচারী পাকশাসকের রূপে আবির্ভূত। যার শোষণের হাত থেকে বাঁচতে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঠিক বেনুর মতোই জীবন পণ করতে হয়েছে। বেনুর চরিত্রনির্মাণে লেখকের অনন্যতা অনস্বীকার্য। বেনুর স্বামী কেরানি আলতাফ। মাছিমারা কেরানি হলেও তার দেশভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর যারা আছে যেমন: কলি, হাকিম সাহেব, রিনা, দিলু, বাবলু, লাবলু, খুকি সবাই টাইপ চরিত্র। এখানে লেখকও একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই উপন্যাসের ভাষানির্মাণেও নান্দনিকতার প্রকাশ লক্ষযোগ্য। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে বেনুর বিলাসভাবনা আলঙ্কারিক গদ্যে বিশেষ রূপ পেয়েছে। যেমন:

> বেনু এখন অন্য বেনু। সারাক্ষণ সমুদ্রের হাওয়া ঝাপটা দেয় বেনুকে। সারাদিন যেন বেনুর চারপাশে কাশফুলের মতো সাদা ফেনা নিয়ে সাগর উড়িয়ে আনে স্বপ্নের মেঘ। সারাক্ষণ স্বপ্ন বুনে চলে বেনু।[৫৩]

আবার সমুদ্রবিলাস দ্রোহের সাথে একীভূত হয়ে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। যেমন:

> মিছিল চলে যায় দূরে। দেয়ালে ক্যালেন্ডারের ছবির সামনে এক পলক দাঁড়ায় বেনু। নিস্পন্দ, স্থির সমুদ্রটা বুঝি ফুলে উঠেছে ঢেউয়ে, এখুনি আছড়ে পড়বে বেনুর ছোট এই ঘরে, ভাসিয়ে নেবে বেনুকে।[৫৪]

ক্যালেন্ডারের পাতায় ছাপানো সমুদ্রের ছবি বেনুর চেতনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতীকায়িত করে বিদ্রোহকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আবার মধ্যবিত্তের ভাবালুতার প্রকাশও দেখা যায়। বসবাসের জন্য একটা আবাসস্থলের স্বপ্নে বিভোর বেনুর ভাবনা লেখকের ভাষায়:

> শূন্য বাড়িটা পলকে হয়ে গেল যেন সুখের সমুদ্র। ... এমন চমৎকার সকাল যেন বহুদিন আসেনি বেনুর এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসারে। নরম রোদ এসে ছুঁয়ে দিয়েছে বেনুর পায়ের পাতা। আধা ময়লা শাড়ির আঁচলে আলোর ছিটে। মাঠের ধারে গাছের ডালে নেচে বেড়াচ্ছে সকালের হাওয়া। এক জোড়া চড়ুই এসে বসেছে বারান্দার রেলিংয়ে, ডাকাডাকি করছে। চায়ের পেয়ালা ঠোঁটের কাছ থেকে নামিয়ে মিষ্টি হাসল বেনু। খুব আস্তে যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলল- আমার বাড়ি হবে, আমাদের নিজের বাড়ি, সেখানে অনেক গাছ লাগাব, নারকেল, সুপুরি, আম, লেবু, পেয়ারা ... অনেক গাছ ... সেখানে তোরা আসবি তো চড়ুই পাখি? ... ছোট্ট একটা টিনের বাংলো বাড়ি, একটু উঠোন, উঠোনের এক ধারে টিউবয়েল, একখণ্ড সবজি বাগান আর বাড়ির সামনে একটুকরো মাঠ, তার চারপাশে ফুলগাছ ... ।[৫৫]

এমন ব্যঞ্জনাময় তথা চিত্ররূপময় ভাষা এই উপন্যাসের। প্রতীকায়িত নামকরণের এই উপন্যাস নির্মাণে লেখকের সযত্ন প্রয়াস আমাদের মুগ্ধ করে। মধ্যবিত্তের যাপিতজীবনে একই জাতির ইতিহাস নির্মাণের কঠিন সময় কীভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় তারই বয়ান *কাছেই সাগর* উপন্যাস।

রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১)এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *ফেরারী সূর্য* প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। উপন্যাসটি ঢাকাকে কেন্দ্র করে মার্চের উত্তাল সময়ের উপস্থাপনায় শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এক মধ্যবিত্ত পরিবার ও তাদের ঘিরে চারপাশটা জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধের ভয়ংকর তাণ্ডবে। পাকবাহিনীর পাশবিকতা, নির্মমতা আর মানবতার চরম অপমানে বিধ্বস্ত জনজীবন। এই পরিবারটি সমগ্র বাংলার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে যেন। প্রতিনিধিত্ব করে অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর। উত্তাল মার্চ থেকে ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত এই উপন্যাসের আখ্যান। ঢাকাকে কেন্দ্র করে হলেও গল্পের শাখা ছড়িয়েছে ঢাকার বাইরে গ্রামীণ জনজীবনের মধ্যে। উপন্যাসে দেখা যায় করিম সাহেব সরকারি চাকুরে। তার বড় ছেলে খালেদ প্রভুভক্ত সরকারি কর্মচারী। আর বাকি দুই ছেলে আশেক ও আবেদ পাকশক্তির জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার। মেয়ে জাকিয়াও এই দুই ভাইয়ের সমর্থক। মেয়ের জামাই ডাক্তার রকীবও এই দলের। এমনকি বড় ছেলে খালেদের স্ত্রী বকুলও এদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। এই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ করে আশেক ও আবেদের বন্ধুবান্ধবদের সম্পৃক্ততা আখ্যানকে বিস্তৃত করেছে। রাকার পরিবার পঁচিশে মার্চ কালরাতে গৃহকর্তাকে হারায়, হারায় বড় সন্তানকে। ইকবাল, মামুন, বাদল, আব্দুল্লাহ, রমজানের মা, বাচ্চু, ময়নার মা, ময়না, বাকের খান, গ্রামের লোকজন এরকম বহুজনসমাগম ঘটেছে উপন্যাসে। বৃত্তাকার আখ্যানে শাখাকাহিনির সমাবেশও অল্পস্বল্প ঘটেছে। যেমন রাকার পরিবার, রমজানের পরিবার, ময়নাদের পরিবার কিংবা মামুনের। এরা সবাই স্বতন্ত্র হলেও আশেকদের ঘিয়ে রয়েছে। এই পরিবারকে আঁকড়ে বেড়ে উঠেছে এই শাখাগুলো। সবাই যুদ্ধাক্রান্ত, যুদ্ধের বিভীষিকায় ক্ষতিগ্রস্ত। সবার চেতনাগত অনুভব একসূত্রে গাঁথা যেন।

১৪৫ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিতে কোনোরকম অধ্যায় বিভাজন ছাড়ায় আখ্যান বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধ ঢুকে পড়েছে। কিংবা যুদ্ধাক্রান্ত একটি

পরিবারের গল্প এটি। প্লটের বিন্যাস-কৌশলে এই পরিবারটি পুরো দেশ হয়ে ওঠে। মধবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে সমাজের উচুঁতলার কিছু মানুষ আর নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে শ্রমজীবী লুম্পেন জনমানুষও উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। ফুটে উঠেছে তাদের বিশ্বাস মূল্যবোধ। উত্তাল মার্চে আখ্যান শুরু। লেখক বলছেন, "রাজপথে পথিক নেই। উত্তেজিত জনতা। উত্তপ্ত মার্চের প্রথম তারিখে ক্রীড়ামোদী যে দলটা সক্রোধে বেরিয়ে এসেছিল স্টেডিয়াম থেকে, স্কুল কলেজ থেকে, হাইকোর্ট থেকে তাদেরই খণ্ডিত সত্তার একক ঘোষণা পোস্টারে, ফেস্টুনে।"[৫৬]

উত্তাল মার্চে ক্রোধে ফেটে পড়া জনতার মিছিলের নগরীতে কাহিনির সূচনা। আশেকের পরিবারে ভিন্নমত অনুসারীদের দেখা যায়। ঠিক এর মধ্যেই ২৫শে মার্চের ক্র্যাকডাউন। "বিকট শব্দ। অগুন্তি অগ্নিগোলা। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছুরিত। কুকুরের আর্তচিৎকার। চৌরাস্তার দিক থেকে কে একজন এল ছুটতে ছুটতে, ভাইরে কিছু আর নেই শহরের ...।" [৫৭] বারুদের গন্ধের সাথে মানুষ পোড়ার গন্ধ বাতাসকে ভারি আর বিষণ্ন করে তোলে ঢাকা শহরের। "শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের ছায়ার মুমূর্ষু নগরীকে আরও করুণ করে তুলেছে অগুন্তি কুকুরের আর্তস্বর।"[৫৮] ভোর হতে না হতেই একরাতে পরবাসী হওয়া লোকজন ঘর ছাড়তে শুরু করে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঢাকা ছাড়ে। কিন্তু রাতের বিভীষিকা দিনের আলোয় প্রতিভাত হয়ে থাকলে সবুজ সংঘের ইকবাল বলে, "আশ্চর্য এই পশুগুলোর সঙ্গে কী করে চব্বিশটি বছর কাটালাম।"[৫৯] আসলেই তাই। এতটা হিংসা পুষে রেখেছিল পাকশাসকরা! এখানে রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ির প্রতিরোধের কথাও এসেছে। এসেছে পাকশাসকদের চাল বদলানোর কথা অর্থাৎ এই আর্মি ক্র্যাকডাউনকে 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে বিশ্বে চালিয়ে দেওয়ার চালাকি। আশেকের প্রিয় নারী রাশা, বাবা আর ভাইকে হারিয়ে মা ও ছোটভাইকে নিয়ে ময়নার বাপের সাথে তাদের গ্রামে আসে। ময়নার বাপ রাশাদের কাছে দুধ বিক্রি করত। এই দুর্বিষহ সময়ে রাশাদের আশ্রয় দেয় ময়নার বাপ। এভাবে আখ্যানে ঢাকা শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদও ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেখানেও মিলিটারি হামলা করে। আবার আস্তানা বদল করে নিজ দেশে মুসাফির বনে যায় রাশারা বা সকলে। বুড়িগঙ্গা পেরোতে গিয়ে আরও ঘরছাড়া মানুষ আখ্যানে রাশাদের হাত ধরে চলে আসে। পথে নামা মানুষদের অনিশ্চয়তায় ভরা আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের পরিচয়ে আখ্যানে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। রাশার ছোটভাই রিপন অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার রকীবের দেখা পায় তারা। যে আশেকের বোনজামাই এবং এখানে আশেকেরও দেখা পায় রাশা। আশেক বলে:

> এখন আমি আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করে ফেলেছি আপোসের মনভাব [মনোভাব] নিয়ে অনেক ভুগেছি, . . . কিন্তু আর নয়। . . .
>
> আমরা সৈনিক হয়েছি, আবাসিক এলাকা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র। ঘরগুলো শিবির। মানুষগুলো মনের পোশাকে সৈনিক, সেনাপতি।[৬০]

এভাবে আখ্যানে ব্যক্তিমানুষের অসহায়তার পাশাপাশি প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের কথাও উপস্থাপিত হয়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের প্রসঙ্গ এসেছে। রাশারা ঢাকায় ফিরে আসে। পাকপ্রভুভক্ত আশেকের বড় ভাই খালেদ চাকরিতে প্রমোশন পায়। এটাতে বুঝায় পাকশাসকরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সচেষ্ট। তারা তাদের কাছের লোকদের এভাবে প্রণোদনা দিয়ে নিজেদের অরাজকতাকে একটা স্বাভাবিক রূপ দিতে চায়। আছে বাকের

খানের মতো লোক। যারা যুদ্ধপরিস্থিতিতে ফায়দা লুটতে সিদ্ধহস্ত। এই শ্রেণির লোকদের জন্যই এদেশের আপামর জনসাধারণের জীবন বেশি দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। অথচ 'বাঘের ঘরে ক্ষোগের বাসা'র মতো ব্যাপার এই যে, এই বাকের খানের ছেলে মুক্তিবাহিনীর একজন। সেসময়টা এরকম দেখা গেছে একই পরিবারে সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতা।

আখ্যানে দেখা যায় পাড়ার বখাটে ছেলেটা যুদ্ধের সময় কেমন পাল্টে যায় কিংবা পড়ুয়া ছেলে মামুন অস্ত্র লুকিয়ে রাখার মতো কঠিন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়। আছে গোমুর্খ পাকসেনাদের হাস্যকর কর্মকাণ্ডের বিবরণ, টর্চার সেলের প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। ক্যান্টনমেন্টে নারীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার অনুষঙ্গ রয়েছে। রাজাকারদের নির্মমতাও উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, গেরিলা আক্রমণ, তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষজন এমনকি শিশু বাচ্চু পর্যন্ত পাক আর্মির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত এমন চিত্রায়ণে আখ্যান পরিপূর্ণ। মানুষের অসহায়তা, অর্থনৈতিক সংকট এসব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। একটা সময় দেখা যায় আশেকদের বাড়িতে পাক আর্মি হামলা করে এবং পাকপ্রভুভক্ত খালেদের স্ত্রী বকুলকে নিয়ে যায়। পাগলের মতো স্ত্রীকে খুঁজে ফেরে খালেদ। দিনকয়েক পর একটা জিপ এসে প্রায় নগ্ন, অর্ধমৃত বকুলকে বাড়ির সামনে লাথি মেরে গড়িয়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। বকুল এই অপমান সহ্য করতে পারে না। ঘরে ফিরে আত্মহত্যা করে। একে একে মাতৃভূমি দখলমুক্ত হতে থাকে। আর এর সঙ্গে বাড়তে থাকে প্রিয় মানুষ হারানোর খবর। কাউকে কাউকে উদ্ধার করা হয়। কাউকে না বলে কয়েকজন শিশু বাচ্চু, রিপন, ময়না, মিঠু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সীমান্তে পাড়ি জমায়। তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাচ্চু রক্ষীদের গুলিতে প্রাণ হারায়। নিজের পিতাকে হারিয়েছিল যুদ্ধের শুরুতে। এখন সেও পিতার সঙ্গে মিলিত হতে চলে যায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মিলিত বাহিনীর যৌথ আক্রমণে পর্যুদস্ত পাক আর্মির সেই দৃশ্যের অবতারণা আছে। এই সময় আশ্রয় দেয় মুক্তিবাহিনীর দুজনকে আশেকের পরিবার। তাদেরকে রক্ষাও করে আর্মির ছোবল থেকে। লেখক বলছেন সেই সময়ের ঢাকার অবস্থা:

> দিনেরাতে আর তফাৎ নেই। কুকুর পর্যন্ত নামতে সাহস পায় না রাজপথে। কান পেতে থাকলে বোধ হয় শোনা যায় পাড়ার অবশিষ্ট কয়েক হাজার মানুষের চাঁপা শ্বাস-প্রশ্বাস। নগরী ঢাকা প্রাণীর নয়, যন্ত্রের। থেকে থেকে ওদেরই শব্দে চকিত দিক দিগন্ত।[৬১]

বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ডাক্তার রকীবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে পাক আর্মি। চারদিকে যখন বিজয়নিশান উড়ছে তখন রকীবের সন্তানসম্ভবা স্ত্রী জাকিয়া জ্ঞান হারায়। অসময়ে সন্তান প্রসব করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সে। আট মাসে জন্মানো সদ্য নবজাতক যে বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে তাকে কোলে তুলে নেয় রাশা। আশেপাশের ক্যাম্পগুলোতে ময়না আর তার মাকে খুঁজতে বের হয়ে যায় আশেক। রাশা ঠিক করে নবজাতকের নাম রাখবে মুক্তি। স্বাধীন ভূমিতে জন্মেই সে সব হারিয়েছে। আখ্যানের পরিসমাপ্তি এখানেই। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের ন্যায় এও এক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু এত প্রাণহানি হয়েছে যে বিজয়ের আনন্দ আর উল্লাস করার মতো মানসিক অবস্থা জীবিতদের নেই। লাল-সবুজের পতাকা যখন শ্যামল বাংলার নীল আকাশে উড়ছে তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে চাপা দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দনের রোল। এই আখ্যানে যুদ্ধ পরিস্থিতি একটি পরিবারের প্রেক্ষাপটেই ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের সংকট থেকে জাতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

ও সামাজিক সংকটের চুলচেরা বিশ্লেষণেরও প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ও মতাদর্শের মানুষের মিলিত প্রবাহে টান টান উত্তেজনায় যুদ্ধদিনের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে *ফেরারী সূর্য*- এর শরীর জুড়ে।

এই উপস্যানের চরিত্রায়ণ পদ্ধতিতে সরলরৈখিক ফর্মকে অবলম্বন করা হয়েছে। আশেক এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে আখ্যান আবর্তিত। ভাবালুতা, পারিবারিক বন্ধন, আন্তরিকতা আর লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তার মিশেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্রগুলো বাস্তবঘন হয়ে উঠেছে। আশেক, আবেদ দাবি আদায়ে সোচ্চার, মিছিলের অগ্রভাগে জায়গা তাদের। সময়ের প্রয়োজনকে অঙ্গীকৃত করে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করতে শিখেছে। অথচ এদের বড় ভাই খালেদ অন্য ধাতুতে গড়া। পাক সরকারের চাকুরে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাসী কর্মচারী সে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন চরম মূল্য দিতে হলো তাকে তখন তার সব বিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়ে গেল। খালেদের স্ত্রী বকুল যাকে ঘর থেকে মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পর অর্ধমৃত অবস্থায় ফেরত দিয়ে গেলে জীবন তার কাছে অসহ্য ঠেকে। আত্মহত্যা করে বসে বকুল। বকুল আমাদের দুলক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের প্রতীক। তাদের জীবনের দীর্ঘশ্বাসের রূপ বকুল। আশেকের প্রিয় নারী রাশা। জীবনে বিষাদময় অভিজ্ঞতা তার বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। পিতা এবং বড় ভাইকে হারিয়ে মা আর ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। জীবনের তাগিদে চাকুরির অন্বেষণে ঘুরতে হয়েছে পথে কখনোবা নিরাপত্তার জন্য এক আশ্রয় ছেড়ে আরেক আশ্রয়ে। অদম্য সাহস আর দৃঢ়তার জন্য লড়াই করে শেষ পর্যন্ত। আছে জাকিয়া আর তার স্বামী ডা. রকীব। ডা. রকীব মানুষের সেবাকে অঙ্গীকৃত করে লড়ে গেছে মুক্তিবাহিনীর সাথে এই শিবির থেকে সেই শিবির। চূড়ান্ত বিজয়ের সময় তাকে বাড়ি থেকে মিলিটারিরা মিথ্যে বলে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আর স্বামীর শোক সামলাতে না পেরে গর্ভের সন্তানকে অসময়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জাকিয়া। এদের মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয় যুদ্ধের বীভৎসতাকে। এখানে আছে সবুজ সংঘের সদস্যদের প্রসঙ্গ। ইকবাল, বাদল, আব্দুল্লাহ, মঞ্জুর এরকম আরও অনেকে, যারা লড়ে গেছে পঁচিশে মার্চের আগে থেকেই। এমন অসংখ্য বাংলামায়ের দামাল ছেলেরা ঘরকে পর করে বাহিরকে আপন করেছিল বলেই না এক অসম যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। পঁচিশে মার্চের আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর লেখকের ভাষায়, "সবুজ সংঘের মেঝেতে বসে বিস্ময়ে ভেঙে পড়েছিল ইকবাল- আশ্চর্য এই পশুগুলোর সঙ্গে কী করে চব্বিশটি বছর কাটালাম।"[৬২]

এমন করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল আসলে সাড়ে সাতকোটি মানুষই। এই সবুজ সংঘের সাহসী উদ্যমী ছেলেরা ভালো ছাত্র মামুনকে নিয়ে পরিহাস করত। যুদ্ধাক্রান্ত দেশে মামুনরাও নিজের অসহায়ত্বে কাতর হয়ে সাহসী হয়ে ওঠে। অস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব সাগ্রহে মাথা পেতে নিয়েছিল মামুন। বিনিময়ে তার বোনদের মিলিটারি ধরে নিয়ে যায় আর টর্চার সেলে দুর্বিষহ দিন পার করতে হয় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মামুনকে। রাশার দৃষ্টি দিয়ে লেখক দেখান একটা গলাকাটা লাশের মানুষকে। লেখকের ভাষায়:

> নির্মীলিত নিরক্ত মুখটি তখন চেনেনি কিন্তু পরে চিন্তা করে বের করেছিল সে মুখের মালিক পাড়ার সেই বখাটে ছেলেটা। আন্দোলনের সময় যার চরিত্র বদলে গেছিল আশ্চর্য ধারায়। রোয়াকে আড্ডা নয়, স্কুল ফেরৎ মেয়েদের পিছে নয়, পাড়ার মিছিলের পুরো ভাগে নিশান

> ওড়াতো, কান ফাটানো অগ্নি স্লোগানে ভেঙে দিতো পথ প্রান্তের মৌনতা। তাই ওর গলা আর কব্জি কাটা।[৬৩]

এভাবে পরোক্ষ বিবৃতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রায়ণ করেছেন লেখক। এখানে এই ছেলেটির মতো অনেকেই সময়ের প্রয়োজনে বদলে গিয়েছিল। মৃত্যুটাকে হাতের মুঠোয় পুরে জীবনের গল্প বানাতে পথে নেমেছিল। এই উপন্যাসে রমজানের মতো নিম্নবর্গের মানুষও ঠাঁই পেয়েছে। যারা ভেবেছিল ভোটের পর সুদিন আসবে। কিন্তু সুদিন তো দূরের কথা জীবন টিকিয়েই রাখতে পারে না তারা। দুধ বিক্রেতা ময়নার বাবাও তেমনি একজন। ময়না, ময়নার মা, রমজানের ছেলে বাচ্চু, রমজানের মা এরকম আরও অনেক ছিন্নমূল মানুষেরা তাদের যাপিত জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে আখ্যানে উপস্থিত। তাদের চিন্তাও বিশেষত্ব পেয়েছে যেন। ময়নার বাবা যখন বলে, "নিজ দ্যাশে আইজ পরবাসী মুসাফির বইনা গেছি আমরা।"[৬৪] তখন রাশা ভাবে "এই মুহূর্তে বর্ণাক্ষরবর্জিত ময়নার বাবার যে উপলব্ধি সে যেন গোটা দেশের।"[৬৫] আসলে সময় মানুষকে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কার্যকর তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। জেবুন্নেসা, মরিয়ম যেন মাতৃত্বের চিরন্তন রূপ। আরেকজন বশীরুল্লাহ যে একরাতে স্ত্রী সন্তান সব হারিয়ে পথে নেমেছিল নিঃস্ব হয়ে। রাশারা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল। অদ্ভুতভাবে নিজেদের অসহায়তাকে বিশ্লেষণ করে সে। বলে, "মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের অত দামই যদি থাকতো তবে কি আর একটা স্বাধীন দেশের মানুষ পরাধীন হয়ে যায়। মুসলমানের হাতে মুসলমান মরে, কুকুর বেড়ালের মতো গুলি খেয়ে।"[৬৬] তার কথায় নিরাশ্রয়, নিরপরাধ মানুষের আহাজারি ফুটে উঠেছে। এভাবে কখনো স্বল্প, কখনো দীর্ঘ উপস্থিতিতে বেশ কিছু চরিত্রের সমাগমে পরিপূর্ণ *ফেব্রারী সূর্য* উপন্যাসখানি। কিছু পাকআর্মি চরিত্রও রয়েছে। আর আছে এদেশীয় তাদের কিছু দালাল। যেমন: বাবোর খান। যার নিজের ছেলে যুদ্ধে গেছে কিন্তু সে পাক আর্মির পদলেহনে বিভোর হয়ে আছে। রাশাকে ক্যাপ্টেন ফারুকীর সেবা করতে বলে। অথচ রাশা তার দূর সম্পর্কে ভাইয়ের মেয়ে। তার পাশে দাঁড়ানো বাদ দিয়ে তাকে ব্যবহার করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চায়। এরকম বাকের খানরা ছিল বলে আমাদের আরও বেশি দাম দিয়ে স্বাধীনতাকে কিনতে হয়েছে। বিস্তৃত কলেবরের এই উপনস্যাসে অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। শিশু, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে বাস্তবনিষ্ঠভাবে কখনো সংলাপ, কখনো পরোক্ষ বিবরণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাসে মানভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে চরিত্রের সংলাপে স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে উপভাষাও এসেছে মানভাষার পাশাপাশি। যেমন:

উচ্চ শিক্ষিত খালেদ ছোট ভাই আবেদের মিছিল মিটিং-এ অংশ নেওয়াকে তাচ্ছিল্য করে। লেখকের ভাষায় বর্ণনাটা এমন :

> খালেদ পাইপ কিংবা ভাষা কোনও একটাকে চিবানর ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে, তোর আন কালচার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়াচ্ছে।[৬৭]

রিক্সাচালক রমজান স্ত্রীর সাথে বচসায় জড়িয়ে রাগের মাথায় বলে:

> খবরদার এমুনধারা কথা কইছত কি মরছস আমার হাতে।[৬৮]

সংলাপের মাধ্যমে এভাবে পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে চরিত্রের অবস্থানের। লেখকের বর্ণনার ভাষাতেও বেশ পরিচর্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ২৫শে মার্চের ধ্বংসযজ্ঞের পর-

> ঢাকা এখন জাহান্নাম, ঢাকা এখন হাবিয়া। . . .
> দক্ষিণের মাঠের ওপারে পোড়া, আধ পোড়া গাছের সারি। লাল্‌চে টিনের বিক্ষিপ্ত পাঁজর, চক্রাকারে ওড়া কটা শকুন, বারবার জীভ চাটা কুকুর, ধূলায় গড়ানো বিবর্ণ মৃত মানুষ, ভাঙা দোলনা ...।[৬৯]

আরকেটি বর্ণনায়:

> বাইরে নীলচে আকাশে তারার ঝিকিমিকি নয়। হেলিকপ্টারের সরীসৃপ চোখ। দূরে বাকল্যান্ড বাঁধে ঘন ঘন কামানের গর্জন। ভীতিকর জনপদ। তেরো নম্বরের সদরে তিন টুকরো মৃত মানুষ। হ্যাপি কটেজের বোগনভিলার ছায়ায় ছাল ছাড়ানো আদম সন্তান। মাঠের স্কুল বাড়ির ক্যাম্পে ময়না আর ওর মায়ের ...।[৭০]

উপরের বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সময় আর বিষয়কে উপস্থাপনে ভাষার শৈলীগত পরিচর্যার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। গদ্য খুব বেশি আলঙ্কারিক না হলেও লেখকের অনুভূতির তীব্রতা বোঝাতে তা সক্ষম।

এই উপন্যাসের কয়েকটি জায়গায় বেশ হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ, কখনো পাক আর্মির সদস্য এদের উদ্‌গাতা। হয়তো যুদ্ধদিনের কথামালায় ঠাসা বলে এগুলোকে অনেকটা প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু টানটান উত্তেজনায় ভরা কথার মধ্যে পাঠককে একটু রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা এই হিসেবে বিবেচনা করলে অনেকটা মানানসই মনে হবে। উপন্যাসের নামকরণ প্রতীকায়িত। নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়া সাড়ে সাতকোটি মানুষের জীবনে সূর্যও ফেরারী- অর্থাৎ আলো, আশা, আছ্বারা যেন উধাও। শুশ্রূষার জল নিয়ে কেউ কোথাও নেই। এমন পরিস্থিতি বোঝাতে এই প্রতীকী নামকরণ যা নান্দনিকতায় উজ্জ্বল।

আমরা এই আলোচনায় মোট ছয়টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। সবগুলো উপন্যাসেই কমবেশি মধ্যবিত্ত একটি পরিবারকে কেন্দ্রীভূত করে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাকে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা ভুললে চলবে না যে যুদ্ধটার সাথে মধ্যবিত্তের একটা অন্য ধরনের সংযোগ ছিল। এদেরই একটা শ্রেণি অসম সাহসিকতা দেখিয়েছে আবার একটা শ্রেণি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পাকশাসকদের পদলেহন করেছে। একরাতে সাড়ে সাতকোটি মানুষ নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে যায়। নিজেদের অসহায়তায় নিজেরায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য উৎকণ্ঠা আর স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর তখন এই জনপদের মানুষ। হাজার বছরের পুরোনো সংস্কৃতি ধ্বংস করতে উদ্যত শকুনের কালো থাবা। পোড়ামাটির নীতি মাথায় নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এমন বিষণ্ন এবং বিভীষিকায় ভরা জীবনের বয়ান আছে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলোতে। মুক্তিযুদ্ধের এসব উপন্যাসে যুদ্ধের বিভীষিকা আর স্বজন হারানোর মর্মন্তুদ আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে। আছে যাপিত জীবনের ছবি যার মধ্যে যুদ্ধ এসে পাল্টে দিয়েছে বিশ্বাস, আশা আর বেঁচে থাকার লড়াইকে। আছে যুদ্ধ নিয়ে চুলচেরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণও। ২৫শে মার্চের ভয়াল কালরাতের রোমর্হষক বর্ণনার পাশাপাশি বুটের তলার থেঁতলে যাওয়া শ্যামল বাংলার ছবিটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই এঁকেছেন কথার কারিগররা। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ আর লড়াকু

জনমানুষের কথামালায় পরিপূর্ণ। এখানে বীরত্বগাথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক পলকে নিঃস্ব হওয়া স্বজন হারানো, আতঙ্কগ্রস্ত, ভীতবিহ্বল এবং যন্ত্রণায় কাতর মানুষের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাসের গল্প।

তথ্যসূচি:

---

১ মৌসুমি ভৌমিক (অনূদিত), মূল অ্যালেন গিনসবার্গ, Jessore Road by Moushumi Bhowmik, http://testicanzoni. mtv.it>testo-joshore road
২ ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খণ্ড* (৪র্থ সং.; কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ২০০৮), পৃ. ৭
৩ হুমায়ূন আহেমদ, *জোছনা ও জননীর গল্প* (৯ম মু.; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ১৩
৪ *তদেব*, পৃ. ১৩৭
৫ *তদেব*, পৃ. ৫০২
৬ *তদেব*, পৃ. ৫০৫
৭ মোহাম্মদ আজম, *হুমায়ূন আহেমদ পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য* (ঢাকা: প্রথমা, ২০২০), পৃ. ১৫১
৮ হুমায়ূন আহমেদ, পৃ. ৩৮০
৯ *তদেব*, পৃ.
১০ *তদেব*, পৃ. ৪০৬
১১ *তদেব*, পৃ. ১৩
১২ *তদেব*, পৃ. ২৫৭-২৫৮
১৩ মোহাম্মদ আজম, পৃ. ১৫২
১৪ আনোয়ার পাশা, *রাইফেল, রোটি, আওরাত* (ষষ্ঠ সং.; ঢাকা: স্টুডেন্ড ওয়েজ, ২০১৭), পৃ. ৬
১৫ *তদেব*, পৃ. ২
১৬ *তদেব*, পৃ. ১৮০
১৭ *তদেব*, পৃ. ৫
১৮ *তদেব*, পৃ. ৩১
১৯ *তদেব*, পৃ. ৭৬
২০ আবুল ফজল, 'পরিচিতি', আনোয়ার পাশা, *রাইফেল, রোটি, আওরাত*
২১ *তদেব*
২২ *তদেব*
২৩ আনোয়ার পাশা, পৃ. ৫
২৪ *তদেব*, পৃ. ৫০
২৫ *তদেব*, পৃ. ৪
২৬ *তদেব*, পৃ. ৯৮
২৭ *তদেব*, পৃ. ১১৯
২৮ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩১২
২৯ সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড* (ষষ্ঠ সং.; ঢাকা: অনন্যা, ২০১৯), পৃ. ৬২
৩০ *তদেব*, পৃ. ৭১
৩১ *তদেব*, পৃ. ৮০
৩২ *তদেব*, পৃ. ১২৮
৩৩ *তদেব*, পৃ. ৭৪
৩৪ *তদেব*, পৃ. ৬৩

[৩৫] *তদেব*, পৃ. ৬২
[৩৬] রফিউল্লাহ খান, পৃ. ৩১৯
[৩৭] শওকত ওসমান, 'জলাংগী', *উপন্যাস সমগ্র*-৩ (ঢাকা: সময়, ২০০২), পৃ. ৬৪
[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৭৯
[৩৯] *তদেব*
[৪০] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ১৯৯৫), পৃ. ১৮১
[৪১] শওকত ওসমান, পৃ. ৭৩-৭৪
[৪২] *তদেব*, পৃ. ৭০
[৪৩] *তদেব*, পৃ. ৭১
[৪৪] রিজিয়া রহমান, 'কাছেই সাগর,' *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ৪৫৬
[৪৫] *তদেব*, পৃ. ৪৫৯
[৪৬] *তদেব*, পৃ. ৪৫৯-৪৬০
[৪৭] *তদেব*, পৃ. ৪৭৩
[৪৮] *তদেব*, পৃ. ৪৭৭
[৪৯] *তদেব*, পৃ. ৪৯০
[৫০] *তদেব*, পৃ. ৫১০
[৫১] *তদেব*, পৃ. ৪৬০
[৫২] *তদেব*, পৃ. ৪৮৭
[৫৩] *তদেব*, পৃ. ৪৭২
[৫৪] *তদেব*, পৃ. ৪৭৩
[৫৫] *তদেব*, পৃ. ৪৫২-৪৫৩
[৫৬] রাবেয়া খাতুন, 'ফেরারী সূর্য', *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৯), পৃ. ১৩
[৫৭] *তদেব*, পৃ. ২১
[৫৮] *তদেব*, পৃ. ২৪
[৫৯] *তদেব*, পৃ. ৩৩
[৬০] *তদেব*, পৃ. ৫৪
[৬১] *তদেব*, পৃ. ১৪৭
[৬২] *তদেব*, পৃ. ৩৩
[৬৩] *তদেব*, পৃ. ৪১
[৬৪] *তদেব*, পৃ. ৪৭
[৬৫] *তদেব*
[৬৬] *তদেব*, পৃ. ৪৯
[৬৭] *তদেব*, পৃ. ১৬
[৬৮] *তদেব*, পৃ. ২০
[৬৯] *তদেব*, পৃ. ২৯
[৭০] *তদেব*, পৃ. ১৫৫